অন্বেষণ

অন্বেষণ

রমাপদ চৌধুরী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স: কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ ঃ সমীর সরকার

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ, তেরশ' ষাট সাল

প্রকাশক ঃ মলয়েন্দ্রকুমার সেন

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

৫১, বেনিয়া পুকুর রোড, কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর ঃ অবনীমোহন পালচৌধুরী

জাতীয় মুদ্রণ

৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ব্লক ঃ টাওয়ার হাফটোন কোং

ক্রীক রো

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ গসেন এণ্ড কোং

৭।১, গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট

বাঁধাই ঃ বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৬১।১, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট

॥ দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা ॥

রচনা কাল—১৩৪০ সাল

হাট মাচন্দার, মেলা মনসাপূজোর। এ তল্লাটে এটাই হ'ল সেরা মেলা। দেন্থর দাঁইহাট ওদিকে, এদিকে কর্জনা কেষ্টপুর। বাবলাডিঙের মেলা, ঘ্যাংটেশ্বরের মেলা, সিংহবাহিনীর মেলা, মেলা মকতপুরের। কোনটাই ছোট নয়। লোক জমে অনেক, দোকান জাঁকায় অনেকেই। তাদের সবারই অবশ্য বসত বেসাতি এখানে নয়, আসে বাইরে থেকে। কাটোয়া, কোলকাতা, বেলুড়, বোলপুর।

মাচন্দার মেলায় এবার তোড়জোড় বেশী, জাঁকজমক অন্য বারের চেয়ে অনেক বেশী।

দীঘি দক্ষিণার পাড় পর্য্যন্ত হোগলার ছাউনি পড়েছে এবার। যাত্রার আসর বসবে। যাত্রাটাও এবার একটু নতুন ধরনের। সেই চিরাচরিত রাম লক্ষণ সীতের কাণ্ডকারখানা নয়। তীর ছোঁড়াছুঁড়ি আর গলাবাজি নয়। বড়ো তরফের মেজবাবু আনাচ্ছেন নতুন যাত্রা। মেদনীপুরের স্বদেশী যাত্রার দল। সত্যিকারের ইতিহাস থেকে দু'চার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাত্রার রূপ দেয় এরা। দু'শো বছরের অত্যাচার অবিচারের ইতিহাস। নীলকর সাহেবদের ঘৃণ্যতা নয়, ক্লাইভ হেষ্টিংসের ক্ষুদ্রতা নয়। তাজা রক্তের কাহিনী। যুগান্তর আর অনুশীলনীর ভাঙানি। চট্টগ্রামের চাঞ্চল্য, নারায়ণগঞ্জের বোমা, মেদনীপুরের গুলি। তার গানের গমক শোনিতের সুরে দেয় পর্দা চড়িয়ে।

—ও সাঙাং, চিরুনি নিবি, চিরুনি? পরীর ছবি আঁকা আরসি নিবি গো, ছয়তানি বোঙা আসবেনি ঘরে।

চুলের ফিতে, মাথার কাঁটা। টুকিটাকি মেয়েভোলানো সরঞ্জাম ওদিকের দোকানে। এদিকেরটায় মিঠাই মণ্ডা কদ্‌মা কৃষ্ণপুলি। শক্তিগড়ের কারিগরের হাতের তৈরী ল্যাংচা, হোক্ না সাতদিনের বাসি। কেষ্টনগরের সরভাজা, হোক্ না ইঁটের মত শক্ত। বটতলার মিহিদানা আর সীতাভোগ, থাক্ না বাদাম তেলের গন্ধ।

পুতুলের দোকানটাও বেশ বড়োসড়ো। শুধু মাটির পুতুলই নয়, আছে মোমের পুতুল, চীনে মাটির পুতুল, কাচের পুতুল, কাঠের পুতুল, টিনের পুতুল, সেলুলয়েডের পুতুল।

কাপড় জামা, রবি বর্মার ছবি। ফটো তোলার দোকান আর ছবি বাঁধাইয়ের।

সার্কাস। এমন কি একটা মদের দোকানও। দেশী বিলিতী দু-ই— ছোটতরফের বড়বাবুর চেষ্টায় আর দারোগা উমেশবাবুর উস্কানিতে মদের দোকানের লাইসেন্স পেয়েছে ধনীরাম।

আর এসেছে কোলকাতা থেকে এক লাইন গণবধূ।

গাঁয়ের ডাক্তার ছিলো সুধীন ভঞ্জ। তা থেকে গঞ্জের প্রধান। তবে, সবই ছিলো, এখন নয়।

লম্বা পাঁশুটে চেহারা। কটা কিন্তু তেজালো ওর চোখ দুটো। সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব বলিষ্ঠতার ছাপ। চুল উস্কোখুস্কো। দীর্ঘ সবল চেহারার বিস্তৃত কাঁধের ওপর ষ্ট্যাচুর মত ভাবলেশহীন অথচ সুন্দর কপাল, চোখ, ঠোঁট, পুরু তামাটে অধরের ওপর ওষ্ঠের চাপ দেখলেই মনে হয় মানুষটা একরোখা আর নয়তো বদ্ধ পাগল। ঠিক পাগল নয়, শুধু লোকে বলে। হবে হয়তো। কে জানে।

ডাক্তারিতে হাত পাকিয়েছিলো সে দু'বছরের মধ্যেই। নাম যশ

ছড়িয়েছিলো গ্রামগরিমার বাতাসে। কলাপুকুরের পাড়ে বাবুইয়ের বাচ্চাটাও জানতো তার বিদ্যের বহর। সদরের বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারকে কানা করে প্রাকটিশ করেছিল শহরে মাত্র ছ'মাস।

দূরের গ্রামীনরা আরো দূরের আধা-শহর গল্‌সি থেকে গুস্করা থেকে ট্যাক্সি ডেকে এনে নিয়ে যেত সুধীনকে। বলতো, হারাণ মোক্তারের হাতে মামলার হার নেই, সুধীন ডাক্তারের হাতে রুগীর মার নেই।

দিনে দু'টাকা, রাতে চার। পাঁচ মাইলের মধ্যে না হ'লে আট টাকা। জলকাদার পথ, কি হাঁটা-মাটির রাস্তা,—আট টাকা। ম্যালেরিয়ার মরশুমে সে বছর মাসে হাজার টাকা আয় হয়েছিলো সুধীন ডাক্তারের।

তারপর হঠাৎ কি যেন হ'ল, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে—

থাক্ সে সব ইতিহাস।

সুধীন মানুষ অনেক উঁচুদরের। শত্রুরা যাই বলুক।

ছেঁড়া পায়জামা, ঢোলা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, মুখে পাইপ। পায়ে জুতো নেই। খালি পায়ে মেলা দেখতে এসেছে ও। সত্যি বলতে কি, মেলাই দেখতে এসেছে। আর কোন উদ্দেশ্য নেই আর আর লোকদের মত।

না।

একবারও যায়নি অশথতলার দিকে। চোখ তুলে তাকায়নি একবারও। ঠোঁট বেঁকেনি, চোখ হাসেনি, দেয়নি হাতছানি কোন অঙ্গরাগিনীর দিকে।

সুধীনের দৃষ্টি বোবা হতে পারে, ওদের মুখ পিছল।

হঠাৎ গানের কলি ভেঁজে উঠলো কেউ, কেউ বা আঁচল খসালো। নিকাজ কথার কেউ নিরর্থক জের টানলে শুধু আপন অস্তিত্ব জানাবার জন্যে। বীণা হয়তো ডেকেই বসতো, সরমা খোঁটা না দিলে। সত্যিই

তো, শহর কোলকাতা থেকে এসে যদি চাদরের খুট ধরে টানাটানি করতে হয় গেঁয়ো মেলায়, তা হ'লে আর ইজ্জৎ রইলো কোথায় ?

বীণাকে ডাকতে হ'ল না। তার আগেই পারুল ও-কোণে শোভাকে ঠেস দিয়ে বলে উঠলো, কৈ রে রূপুসি, দেমাক গেল কোথায় এবার। তোর শোভা যে একবার মুখ তুলেও দেখলো না।

কথাটা শুধু যে শোভাকে উদ্দেশ করেই বললে তা নয়, নিজের মনকেই প্রশ্ন করলে হয়তো !

তাই সান্ত্বনার স্বরে শোভা জানালে, রাতটা জাগুক ! চেয়ে দেখতেই আসবে না শুধু।

পারুল ছড়া কাটলে কি একটা।

তারপরই চোখে চোখে কি যেন কথা হ'ল ওদের দু'জনের।

—যাবি ?

—চল্ না, দেখে আসি লোকটাকে।

ওদের মধ্যে এত বচসা-বিতর্ক, এত চিত্তচাঞ্চল্য, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সুধীনের।

চেয়ে সত্যিই দেখছে না ও কিছু। ওদের কথার কাঁপনেও না। কিংবা, কে জানে, হয়তো ওদের কোন কথাই ওর কানে যাচ্ছে না। কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে। হেঁটে চলেছে হাটের দিকে। চাঁদের নয়, চকমকির নয়। পুতুলের।

মাটির পুতুল, মোমের পুতুল। চীনে পুতুল, টিনের পুতুল। কাচের পুতুল, কাঠের পুতুল। সোলার পুতুল, সেলুলয়েডের পুতুল।

পুতুলের দোকানের পাশেই বসেছে তেতাসের আড্ডা। জুয়ার আড্ডা বসেছে। লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে সেখানে। কেউ খেলছে, কেউ খেলবে কিনা ভাবছে।

ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্থধীন। খানিক চুপচাপ দেখলে খেলাটা।

তিনখানি তাস। একটি রাজা না রাণী, কি যেন! আর দুটো ছোট দরের। কোন্‌টা রাজা বলতে পারলে ডবল পাবে, যা খেলবে তার। ভুল হলে টাকাটা যাবে জুয়াড়ীর বাক্সে।

হারছেই সকলে।

যা হাতসাফাই!—কে যেন মন্তব্য করলে।

স্থধীনের, ঠোঁটের ডগায় হাসি খেলে গেল পরক্ষণেই ভাবলে, না, খেলবে না ও। প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

পুতুলের দোকান থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দল ফিরতি পথে এখানে এসে জমা হচ্ছে, স্থধীন লক্ষ্য করলে। দেখছে তারা রাতারাতি রাজা হওয়ার স্বপ্ন।

স্থধীন হঠাৎ ধমক দিলে জুয়াড়ীকে।

—হাটাও। হাটাও এখান থেকে।

খেলোয়াড়ের দল চমকে ফিরে তাকিয়েই আবার যে যার খেলায় মন দিল। তেতাসওয়ালা একবার তাকালে ওর দিকে, তারপর হেসে আবার তাস বিছুতে স্থরু করলে। হয়তো ভাবলে, পাগল নাকি লোকটা?

স্থধীন অপেক্ষা করলে কিছুক্ষণ।

তারপর আবার বললে, হাটাও, হাটাও এখান থেকে।

—কেন মশাই, ট্যাক্সো দিইনি নাকি, ওঠাবো কেন এখান থেকে। বড়োবাবুর লাইসেন আছে আমার কাছে, ওঠাবো কেন?

যারা জমায়েৎ হয়েছিলো তারাও হেসে উঠলো ওর দিকে তাকিয়ে। লোকটা বলে কি?

চলে যাবে ভাবছিলো ও। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো।

বললে, খেলবে? আমার সঙ্গে খেলবে?

—কেন, যাহু জানেন নাকি। বিদ্রূপ করলে জুয়াড়ী।

তারপর মাটির ওপর পটপট করে তাস কখানা বিছিয়ে বললে, খেলতেই তো এসেছি, খেলুন না টাকা ফেলে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাস ক'খানার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পাইপটা দাঁতে চেপে ধরলে সুধীন, পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে নেহাৎ অন্যমনস্কের মত এধারে ওধারে চোখ ফেরালে বার কয়েক, তারপর জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা ধরলে পাইপের মুখে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে—পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিলে কোণের তাসটার দিকে।

তাস উল্টে দেখার আগেই বললে, দাও কুড়িটা টাকা।

বিদ্রূপের হাসি হাসতে যাচ্ছিল জুয়াড়ী, হাসিটা থমকে থেমে গেল তাস উল্টে দেখতেই।

কুড়িটা টাকা গুণে গুণে তুলে নিলে সুধীন।

আবার তাস বিছিয়ে শেষ করতে না করতেই কুড়িটা টাকাই ফেলে রাখলে ও মাঝের তাসটার ওপর।

—পেয়েছেন!

গলা আর হাত দুই কেঁপে উঠলো তেতাসওয়ালার। হতাশায়, বিস্ময়ে! এ কেমন করে হয়? যাহু জানে নাকি?

—আর খেলবে? সকৌতুকে প্রশ্ন করলে ও।

—খেলুন না, খেলুন। চল্লিশটা টাকা গুণে দিতে দিতে বললে লোকটা।

যে চিরকাল অন্যের নেশা ধরিয়ে এসেছে, সে আজ নিঃস্ব হবে

অপরের কাছে? দুটো দান নয় সুধীন জিতেছে, কিন্তু ভুল কি সে একবারও করবে না?

তাস বিছিয়ে সে আবার বললে, খেলুন, সবাই মিলে খেলুন না।

ভিড়ের থেকে আর একজন কে টাকা ফেলতে যাচ্ছিল ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিলো সুধীন। লোকটা এখনই ভুল করতো। বাঁদিকে নয়, ডান দিকের তাসটার ওপর চল্লিশটা টাকাই রাখলে সে। ভিড় ভেঙে পড়লো এবার ডান দিকের তাসটার ওপর। এক থেকে একান্ন অবধি বাজি ধরলো সকলে।

—রাজা।

একস্বরে সব চিৎকার করে উঠলো তাস তোলার সঙ্গে সঙ্গে। ওর নির্দ্দেশ কখনো ভুল হয় না।

হঠাৎ একটা হট্টগোল আর চিৎকার। হৈ হৈ করে উঠলো সকলে। তাস আর টাকা ফেলে ছুটে পালাচ্ছে জুয়াড়ী। কয়েকজন ছুটে গেল তার দিকে, সুধীন থামালে কয়েকজনকে। ইতিমধ্যে জুয়াড়ীকে ধরে নিয়ে এলো ওরা।

না, টাকা নেই আর জুয়াড়ীর। কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা করে পা জড়িয়ে ধরলো লোকটা। —ছেড়ে দিন বাবু, মাপ করুন বাবু। ভিড়ের থেকে কে যেন দু'এক ঘা বসিয়ে দিলে তার পিঠে, আর লোকট কাঁদতে সুরু করলে।

হো হো করে' হেসে উঠলো সকলে। —যাক, যাক্, ছেড়ে দে ব্যাটাকে, আচ্ছা শিক্ষা হয়ে গেছে। দু'একজন মন্তব্য করলে, আর সুধীন এগিয়ে গিয়ে ছাড়িয়ে নিলে তাকে জনতার হাত থেকে। বললে, যা পালা, আর আসবিনা কোনদিন।

জনতার মনে আর মুখে ছিলো দুঃখ আর অনুশোচনা। তা

নিঃশেষে মুছে দিয়েছে সুধীন। ক্ষতির চেয়েও আত্মগ্লানির অপমান অনেক বড়ো। আরো অসহ্য। ওর নির্ভুল জয়-সমাপ্তি তাদের অশান্ত আর ক্ষুব্ধ মনে দিয়েছে জ্বালাহর প্রলেপ। কৃতজ্ঞতায় বাতাসের গায়ে বাহবা বাজালে তারা।

—কে কত হেরেছ বলো তো? ও প্রশ্ন করলে।

দশ, বিশ, পঁচিশ।

যে যার ক্ষতির অঙ্ক বলে চললো। আর তাদের টাকা ফিরিয়ে দিলে ও। তারপর নিজের মনেই হাসতে হাসতে বাড়ীর পথ ধরলে।

আশ্চর্য্য মানুষের মন। জুয়ায় হেরে যাওয়া টাকা ফিরে পাবার কোন উপায়ই ছিলোনা এদের। লোকসানের ঘরেই ফেলে দিয়েছিলো টাকাটা। লোভ মানুষকে কত নীচে নামিয়ে দেয়। টাকা ফেরৎ পাবার লোভে মূলধনের অঙ্কটা বাড়িয়ে বলতে বাধলো না কারও।

তিরিশ টাকাই হবে কি পঁয়ত্রিশ—সুধীন নিয়ে এসেছিলো। তাছাড়া জুয়াড়ী কি কিছুই আনে নি?

সকলের টাকা ফেরৎ দিয়ে দশটা টাকাও পকেটে নেই তার।

অদ্ভুত মানুষের মন।

নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে চলেছিলো ও। আর ভাবছিলো, কি বলবে সে রাণুকে, কি জবাবদিহি দেবে সে এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের? হঠাৎ শিউরে উঠলো যেন, অনুভবের ভয়ার্ত্ত রোমাঞ্চে ঠোঁট চোখ কেঁপে উঠলো। আবার কি, আবার কি সেই বিষাক্ত রক্তের ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে তার মগজে?

শুনুন।

পৃথিবীর কোন সুর বা সৌন্দর্য্যের দিকে তার মন নেই। কোন রূপ বা রত্নের দিকে নেই চোখ। কোন গন্ধ বা গরিমার দিকে নেই

ইন্দ্রিয়ের ঈপ্সা। তবু, হঠাৎ নরম গলার মিঠে মেয়েলী ডাক শুনে ফিরে তাকালো সুধীন।

—শুনুন।

মৃদু হেসে ওর দিকে এগিয়ে এলো মেয়েটি। অদ্ভুত সুন্দর হয়তো নয়, অজস্র যৌবন নিঃসন্দেহে। নিখুঁত নিস্পৃহতার মাঝেও কোথায় যেন এক নিলাজ আকাঙ্ক্ষার আস্তরণ।

—ও, আপনিও হেরেছেন বুঝি? ও প্রশ্ন করলো।

মেয়েটি ইন্দিরা বসু মল্লিক।

বেথুন থেকে বি, এ পরীক্ষা দেবে আগামী বছর। বয়স বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে ব্যস্ততা। ছট্‌ফট্ করে সর্ব্বদা। দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি, ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি, বোনের সঙ্গে খুনসুরি।

সবসময় সাজগোজ করছে। সাজগোজ করতে ভালো লাগে ওর। বেশবাস, পরিধান আর প্রসাধনই নয়, নিজেকেও অত্যন্ত ভালবাসে ইন্দিরা। দিনরাত ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখছে। কখনো এদিকে ঘাড় কাৎ করে, কখনো ওদিকে। আঁচলটা ঠিক আঁটলো কিনা, ব্রোচটা ঠিক্ বসলো কিনা। কপালে চন্দনের ছোট একটা টিপ পরলে হয় তো, আর পরক্ষণেই মুছে ফেলে আঁকলে বড়ো একটা সিন্দুরের ফোঁটা। তাও হয়তো পছন্দ হ'ল না। লম্বা করে টানলে কাজলের তিলক।

মা ঠাট্টা করে বলে, গেঁয়ো শ্বশুরবাড়ী হলে তোর কি হবে তাই ভাবি।

ঠোঁট উল্টে ইন্দিরা জানায়, বয়ে গেছে পাড়াগাঁয়ের লোককে বিয়ে করতে। তার চেয়ে ইস্কুলে টিচারি করবো।

দাদার কাটা কাটা কথা। —জুতোর দাম বেশী বলে স্যাণ্ডাল পরে ওরা, টিচার হ'লে কি আর পটের বিবিটি সেজে থাকতে পাবি ?

অভিমানে উত্তর জোগায় না ইন্দিরার মুখে।

বলে, না তো না।

—এবার কিন্তু মনসা পূজোয় আমরা দেশে যাবো সব। ছোটদি সেখানে যাক্ আর না যাক্, আমরা যাবই। আব্দার ধরে ছোট ভাই।

ইন্দিরা বিতৃষ্ণায় নাক ফোলায়।—মাগো, কাদা প্যাঁক প্যাঁক করবে রাস্তায় ঘাটে, আমি যাবো না।

বাপের অত্যন্ত আদুরে মেয়ে ও। তাই ওর কথাটাই সকলে বেশি ক'রে ভাবে। ব্যর্থজীবন বড়ো মেয়ের জন্যে যত আত্মশোচনা সব যেন ছোট মেয়ের ওপর স্নেহ হয়ে ঝরে পড়ে। তাই কোন কিছু করবার আগে সবাই জানতে চায় ইন্দিরার মত। আর ও তো চিরকালই গ্রামের ওপর বীতশ্রদ্ধ।

মনে মনে অনেকে অনেক কিছু জল্পনাকল্পনা করলেও শেষ অবধি যে যাওয়া হবে না, এটা সবাই জানতো। জানতো ও যেতে চাইবে না। আর ও না গেলে আর কারোরই যাওয়া হবে না।

কিন্তু সবাই বিস্মিত হলো। দিন পাঁচেক বাকী তখনও মনসা পূজোর। ইন্দিরা নিজে থেকেই হঠাৎ বলে বসলো, দেশে যাবো।

তর্ সইলো না। দুদিনের মধ্যেই সব মাচন্দায় এসে হাজির হ'ল। কে জানে, অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। তখনই রাজি হয়েছে, তখনই আবার হয়তো মত বদলে বসবে।

গ্রামে এসে ওর কিন্তু বেশ ভালই লাগলো। নিজেকে বেশ যেন মূল্যবান মনে হয়। সকলের চেয়ে অনেক ওপরে, মাথাটা যেন আর সবার মাথা ছাড়িয়ে। হেলাফেলায় তাচ্ছিল্য করবে সে, আর সেই

তাচ্ছিল্য পেয়েও গর্ব্বিত হবে এমন লোকের সন্ধান পেল যেন সে এতদিনে।

ঝকঝকে রঙবেরঙের শাড়ী পরে, উঁচু-হিল্ জুতো প'রে, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালো একা একা। মেয়েপুরুষ বাছাবাছি নেই, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আলাপ করে বসে। আর কথাও বলে কেমন যেন একটা উন্নাসিক স্বরে। ব্যবহারে সর্বদা একটা অতিভদ্রতার তাচ্ছিল্য ভাব। গ্রামীনরা তাতেই সন্তুষ্ট। গবিতও কিছুটা।

গ্রামে এসে প্রথম ঘা খেলে ইন্দিরা স্থধীন ডাক্তারের কাছে।

তার ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েই স্থধীন প্রশ্ন করলে, ও আপনিও হেরেছেন বুঝি ?

—না। আঙ্গুলের টোকা মেরে উড়িয়ে দেয়ার মত এক টুকরো ফুৎকারের হাসি হেসে বললে, কিন্তু একদিন না একদিন হারতে তো পারি !

—খেলবেন না। পাইপটা উল্টে আঙুলের টোকা মেরে ছাই ফেলতে ফেলতে স্থধীন বললে।

—খেলিনি তো এদ্দিন। কারণ, ভাবতাম জুয়ায় কেউ জিততে পারে না। আজ আপনাকে দেখে বিশ্বাস হ'ল জেতাও যায়। এরপর তো খেলবোই।

—আপনার খুশী।

—না। ওভাবে এড়িয়ে গেলে চলবেনা। ঐ পুতুলের দোকানটা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি আমি। প্রত্যেকটা দান কি করে জিতলেন আপনি ? খেলার ট্রিকটা শিখিয়ে দিতে হবে আমাকে।

চমকে চোখ তুলে তাকালে এবার স্থধীন। এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করেনি মেয়েটিকে। ছোট্ট ইংরেজী কথাটা শুনে ওর মুখের দিকে

তাকিয়ে দেখলে।

হঠাৎ বললে, আপনাকে চিনলাম না তো ?

—এই গ্রামেই আমাদের বাড়ী,অনেকদিন পরে এসেছি।

—এই গাঁয়েই ?

পুরো পরিচয় দিলে ইন্দিরা।

—ও। তুমিই সেই কলেজে পড়া ক'লকাতার মেয়ে বুঝি ?

বেথুনে পড়া মেয়ে একটু আহত বোধ করলে। গ্রামের মানুষ তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবে আশা করে নি।

সুধীন এদিকে ভাবছে, অদ্ভুত মেয়ে তো! এই কি সেই মেয়েটি, যার সম্বন্ধে এত দুর্নাম ? নেচে নেচে বেড়ায় একা একা। ভয় ডর নেই, সন্ধ্যের পরও টর্চ হাতে এবাড়ী সেবাড়ী করে। পুরুষ মেয়ে ভেদাভেদ নেই, যার তার সঙ্গে দেখা হ'লেই কারণে অকারণে ছুতো খুঁজে কথা পাড়ে, আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। হিল্‌-তোলা জুতো পরুক, সে তো অনেকেই পরে। কিন্তু অমন হেলেদুলে চলে কেন ? কথা কলুক, তা ব'লে অমন আদুরে গলায় ? অর্গ্যাণ্ডির ব্লাউজ পরাটা দোষের নয়, শাড়ীর আঁচলটা গুটিয়ে থাকে কেন মাদ্রাজী চাদরের মত ? শুধু রাণুই নয়, সবাই বলে, সব মেয়েরাই, কন্যকা কুমারী, বধূ বৃদ্ধা সকলেই।

ইন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বুকেও এসেছে একটা ঝড়তুফান। আলোড়ন জেগেছে, ভালই হোক্‌ আর মন্দই হোক্‌ ওর কপালে জুটেছে একটা বৈশিষ্ট্য। আসরে আড্ডায় মাঠে ময়দানে সর্ব্বত্র ফিসফিস কানাকানি তর্ক, সব কিন্তু ইন্দিরাকে ঘিরে।

পুরুষরা মুখে অসন্তোষ দেখায়, মনে মনে কৌতূহল আর কামনা। সাবধানে আর সন্তর্পণে প্রলুব্ধির প্রাঙ্গনে টানে রক্ষণশীলতার আবরু।

অথচ অন্তরে চঞ্চলতা। বাক্যে ব্যাহত, অন্তর্মনে উল্লাস।

—নাম কি তোমার ? প্রশ্ন করল সুধীন।

ইন্দিরা জবাব দিলো বেশ সুদৃঢ় গলায়। বিনয় বিগলিত নয়।

আরো দৃঢ় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো সুধীনের প্রশ্ন। আরো অনুসন্ধানী। কিছুটা বা অশিষ্ট।

প্রশ্ন করলে, তুমি নাকি হৈ হৈ করে বেড়াও সারা দিন, যার তার সঙ্গে দেখা হ'লেই কথা বলো ?

সরু কোমরের ওপর উর্দ্ধদেহটি দোলাতে দোলাতে ইন্দিরা হেসে বললে, কোলকাতায় মানুষ কিনা, গেঁয়ো মেয়েদের মত লজ্জায় ঘরের কোণে বসে থাকতে পারি নে।

—সেখানে এতখানি নির্লজ্জ হ'তে পারো নাকি ? আমার তো মনে হয় অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে হ'লে সাতদিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে নিতে হয় তোমাকে।

খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠলো ইন্দিরা। স্বতঃস্ফুর্ত্ত নয়, সচেষ্ট। বললে, লজ্জাটা বর্ষাতি না ওভারকোট যে সেখানে পরে থাকবো এখানে খুলে রাখবো ?

—লজ্জাটা ভূষণ নয়, বসন। কোথাও খুলে রাখা যায় না। অন্ততঃ উচিত নয়। সুধীন চিবিয়ে চিবিয়ে বললে। তারপর ধীরে ধীরে আবার বাড়ীর পথ ধরলে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ইন্দিরা। ওর মুখের ওপর যেন চাবুক কষে দিয়ে গেল লোকটা। প্রথমটা মুখে কথা জোগালো না। যখন সহজহয়ে উঠলো, সুধীন তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আবার ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল ইন্দিরা।

বললে, লেক্চার দিয়ে সরে পড়ছেন, ট্রিকটা তো বলে দিলেন না ?

রাণুর কাছ থেকে সারাটা বিকেল পালিয়ে পালিয়ে কাটালে সুধীন। ও বুঝতে পারছে, আবার সেই উন্মাদ স্রোতের ডাক ওর শোণিতশিরায়!

ট্রিক?

ইন্দিরার কথাটা মনে পড়তে কৌতুক বোধ করলে ও। অদ্ভুত। এরা সকলেই ভাবে, ও বুঝি বা কোন গোপন রত্নগুহার চিচিং ফাঁক আয়ত্ত করতে পেরেছে, তাসের খেলায় বিশেষ কোন পারদর্শীতা আছে ওর!

না, তা নয়।

ওর এই অশেষ সৌভাগ্যের আড়ালে লুকিয়ে কোন্ এক সুভগ গ্রহের দুর্বোধ্য হাসির কুটিলতা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, নিজেও তা বুঝতে পারে না ও। সত্যিকারের জুয়াড়ী ও কোনকালেই ছিলো না। শুধু তাই নয়। তাসের আসরে ও কোন বিশেষ নেশার খোঁজ পায় না। ভালই লাগে না ওর।

ট্রিক?

সুধীন ভাবলে, সত্যিই যদি কোন পন্থা খুঁজে পেত ও। কোন উপায় বা উপফন্দি। ঐশ্বর্য্য অর্জনের জন্য নয়। ওর বিষাক্ত রুধিরের রুদ্রতা থেকে বাঁচবার জন্যে।

সারাটা সন্ধ্যা মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ীর পথ ধরলে সুধীন! অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। রাত বাড়ছে। আর মত্তমদিরার রেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর দেহের প্রতিটি তন্ত্রী ঘিরে।

দীঘি দক্ষিণার জলে অজস্র চাঁদ নেই আজ। তারালোকের তীক্ষ্ণতা ভাসছে না।

অশান্ত পদক্ষেপে বাড়ী ফিরে এলো সুধীন। উঠোনের বাঁশের

খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ চেয়ে তাকালো আকাশের দিকে। আবার দ্রুত তালে নেচে উঠছে অন্তরস্পন্দন। ঝড়ের উন্মাদনা তার সারা দেহে। শিরার অণুতে অণুতে চঞ্চল রক্তের চমক।

সামনের খ'ড়ো চালে কিসের একটা আওয়াজ। রাতপাখীদের পাখা ঝটপট হয়তো। কাছের তাল গাছে বাবুইয়ের বানাটা দুলছে ঈষৎ হাওয়ায়। আর দূরের সরবনে দুলছে আনতশীর্ষ সরের শুভ্রতা। গভীর অন্ধকারের মাঝেও মনে হয় যেন তুষারের প্লাবন। তুলোর রেজাই যেন।

মাথার ভিতরে অসহ্য এক যন্ত্রণা। সারা দেহ নিঙড়ে যেন আর্ত্তনাদ ফুটে বেরোতে চায়। সুধীনের ইচ্ছে হয়, ছুটে যেতে। সরবন আর কাশবন ভেদ করে দূরে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। পৃথিবীর মত, চাঁদের মত, প্রবালবরণ মঙ্গল-গ্রহের মত, ক্ষুধার্ত্ত রাহুর মত, কুটিল শনিগ্রহের মত, ভূমণ্ডলের প্রতিটি গ্রহউপগ্রহ, চন্দ্রতারা, প্রতিটি নতুন নক্ষত্রের মত কক্ষপথে অবিরল ছুটে চলতে ইচ্ছে হয়। তা হ'লে হয়তো মাঝ-রাত্রির এই চিন্তার নিপীড়ন থেকে নিস্তার পাবে সুধীন।

আর ভাবতে পারে না, ভাবতে পারে না সুধীন। একটা ঘোলাটে কুয়াশার জাল যেন ক্রমে ক্রমে ওর চোখের আর চিন্তার চারপাশ ঘিরে নামছে।

অশান্ত ভাবে পায়চারি করতে থাকে সুধীন। একটা হাত আরেকটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে মোচড় দিতে চেষ্টা করে। ঘাড়ের চুল ধরে টান দেয়, দাঁতের কামড় বসায় ঠোঁটের ওপর।

না, নিজের হাত থেকে নিজেই সরে যাচ্ছে যেন। আপন আয়ত্তের মধ্যে নেই আর আপন সত্তা।

দ্রুত পায়ে দোরের কাছে এগিয়ে এলো সুধীন। তারপর কাঁপা

হাতে ঘন ঘন কড়া নাড়তে সুরু করলে।

কে ?

না, ও একেবারে পাগল হয়ে যায় নি। বেশ মিষ্টি সুরেই কে যেন সাড়া দিলো, শুনতে পেলো ও।

চারদিক নিঃঝুম আর নিঃশব্দ। শান্ত সুপ্তির মাঝে পৃথিবী যেন নিশ্চুপ হয়ে আছে। শুধু বাদল বাতাসের গায়ে ভিজে মাটির চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ।

খুট্‌ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। কপাট খুলতেই সেদিকে তাকালে সুধীন। পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল।

হাতে একটা লণ্ঠন, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট ছায়াছবিতে তার অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে অন্ধকার পটভূমির মাঝেও। নীল দীঘির জলে চাঁদের ছায়াছবি।

ভালো করে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলে। চেনা চেনা লাগলো তার মুখটি। কিন্তু ঠিক্‌ যেন স্মরণ হচ্ছে না।

গাঢ় লাল রঙের একটি সাড়ী পরেছে মেয়েটি। সুগোল সুন্দর মুখ। কপালে সিঁদুরের বড়ো একটা টিপ।

হতভম্বের মত একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সুধীন।

আর ওর উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি দেখেই রাণু বুঝতে পারলো। অনুশোচনায়, রাগে চোখে জল এলো ওর। সত্যি, দুপুরে কেন ছেড়ে দিয়েছিলো ও সুধীনকে! কাজ, কাজ কাজ। না হয় দুদণ্ড দেরীই হত। স্বামীকে আটকে রাখতে তো পারতো তবু। এমন অঘটন ঘটতো না তা হ'লে।

সুধীনের জন্যে অপেক্ষা করে করে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠলো রাণু। খুব পরিচিত হাসি।

অভিশাপের হাসি। এ হাসিটা খুব ভাল করেই চেনে ও। আরো তো কতবার শুনেছে।

ছুটে বেরিয়ে এলো তাই দরজা খুলে। পরমুহূর্তই দেখলে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুধীন। অর্থহীন প্রলাপী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

কান্না ঠেলে এলো রাণুর চোখে।

শান্ত স্বরে বললে, এসো, ভেতরে এসো।

—কে, কে আপনি?

বিস্ময়-বোবা চোখে তাকালো রাণুর দিকে। চিনতে পারলো না। যেন অপরিচিত। কোন দিন যেন দেখেনি! রাণুর কথায় হঠাৎ চমকে উঠে ভীতচকিত ভাবে প্রশ্ন করলে, কে, কে আপনি?

বিষন্ন হাসি হাসলে রাণু।

বললে, ভেতরে এসো।

স্বামীর চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পেরেছে রাণু। অনেক অনেক অশান্তি বহন করে আনে এই দৃষ্টি। আর ঐ অবোধ্য হাসির উন্মাদনা।

মেলার মালঞ্চে এখনও টিমটিম করে জ্বলছে কয়েকটা লণ্ঠন। চিক আর চাঁচড়ের দোকান ঘরগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। কেবল জোনাকির মত কয়েক টুকরো আলোর কণিকা।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠলো রাণু। ও, না। ওর নিজেরই দীর্ঘশ্বাস।

—ব'সো এখানে।

সুধীনের কাঁধে হাত দিয়ে তাকে খাটের ওপর বসালো। তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ওর চোখের দিকে। ঠেলে উঠলো চাপা কান্না।

সুধীনকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলো হঠাৎ।

বললে, কেন, কেন তুমি খেলতে যাও? এমন নেশা কি করে হ'ল তোমার। কেন কথা রাখতে পারো না?

দুর্বোধ্য হাসিতে উদভ্রান্ত দেখালো সুধীনকে।—খেলবেন আমার সঙ্গে? খেলবেন? টাকা, টাকা, সব টাকা জিতে নোব, সব টাকা।

—হ্যাঁ, খেলবো।

চট্ করে সরে এলো ও, ট্রাঙ্ক খুলে বের করলে তাসের প্যাকেট। আর টাকা।

খাটের ওপর বসলো সুধীনের সামনে।

—টাকা, টাকা? কত টাকা আছে আপনার? সব জিতে নোব।

পাগলের মত আজেবাজে বকে চললো একজন, আর অন্যজন শান্ত, স্থির।

নিঃশব্দে তাস ভাঁজছে রাণু।

—কি, কি খেলবেন?

ভগবানে ভক্তি তার থাক্ আর না থাক্, এই একটি আশীর্ব্বাদের জন্যে রাণু আজও কৃতজ্ঞ। এ জ্ঞান হঠাৎ কি ভাবে যেন আয়ত্তে এসেছিলো। বহুদিন আগে। সেদিনের কথা ভেবে নিজেই বিস্মিত হয়ে ওঠে রাণু। ওর মত মূর্খ অজ্ঞ মেয়ের পক্ষে এমন একটা আবিষ্কার কি করে সম্ভব হ'ল!

স্বামীর এই বিচিত্র রোগের পরিচয় পেয়েছিল ও বিয়ের এক বছর পরেই। না, একটি বছরে একদিনের জন্যেও তাস ছোঁয় নি সুধীন। তাস খেলতে কিছুতেই রাজি হ'ত না। বলতো সেই অবোধ্য রহস্যের কথা। কিন্তু রাণুই কি বিশ্বাস করেছিল তখন। হাসতো শুধুই, ভাবতো ওকে ভয় দেখাবার জন্যেই বুঝিবা সুধীন এই অসম্ভব কথাগুলো বলে।

তারপর কেন যে সেদিন বাজি রেখে তাস খেলতে বসেছিলো রাণুদের সেই কলোণীর বাড়িতে। সেই রাত্রেই প্রমাণ পেয়েছিল রাণু স্বামীর সুস্থ শরীরের শিরায় উপশিরায় কি যেন এক উন্মাদ বীজ লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা নিজের চোখেই দেখেছিল ও।

একদিন সুধীন কানে-কানে যে গভীর লজ্জার কথা খুলে বলেছিলো তা প্রথমে তো অবিশ্বাসের হাসিতে উড়িয়ে দিয়েছিল রাণু। এমন চমৎকার ব্যবহার যার, কথায়বার্তায় আলাপে আপ্যায়নে যার এতটুকু খুত নেই, সে নাকি পাগল! হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো। তারপর বিবাহিত জীবনের একটি বছর কেটে যাবার পর হঠাৎ এক দিন বুঝলে, সত্যিই সুধীনের রুধিরস্রোতে কোথায় যেন মাতালি রক্তের কণিকা লুকিয়ে আছে।

আরো কতবার তো এ অদ্ভুত রহস্য দেখেছে ও, বৃথাই চাবি খুজেছে তার। সুধীনের ব্যবহারে, সুধীনের হাসির উচ্ছলতায়।

সুধীনের বিশ্বাস, কোন গ্রহতারার সংযোগ নাকি তার মাথার ভেতর এই বিষ এনে দেয়। অতিসৌভাগ্যের কি এক অবোধ্য অভিশাপ।

হ্যাঁ। তাস খেলতে বসলেই কোন এক নৈসর্গিক শক্তি যেন ওর ওপর ভর করে। পরপর প্রত্যেকটি দান ও জিততে থাকে। কোন পাকা জুয়াড়ীও ওকে হারাতে পারে না। তারপর, সেই রাত্রেই আসে বিভীষিকা, উন্মাদ হয়ে ওঠে ও। পাগল হয়ে যায়।

এক হপ্তা, এক মাস—হয়তো আরো বেশী দিন, হয়তো চিরতরেই পাগল হয়ে যেতে পারে সে। ও তা জানে। তাই, তাই তাস খেলতে চায় না কখনো। জুয়ার আসরের কাছ দিয়েও ঘেঁসতে চায় না। তবু, মাঝে মাঝে, হয়তো কোনো গ্রহতারার সংযোগই তাকে টেনে

নিয়ে যায়।

—কৈ, খেলুন। তাস দিন, তাস। সব টাকা জিতে নোব। বদ্ধ পাগলের মত হাসতে থাকে সুধীন।

কি যেন ভাবছিল রাণু, হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙলো।

তাস বিছোতো সুরু করলো ও।

—কি খেলবেন ? তে তাস ?

—ছ'দানি। রাণু উত্তর দিলে।

রাণু আজও বুঝতে পারে না। এ জ্ঞান সে কি করে পেল। দেবতার অদৃশ্য আশীর্বাদ যেন। তা না হ'লে, এতদিনে স্বামী হয়তো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেত।

খেলা সুরু হ'ল। নিজের টাকার অর্ধেক দিলে সুধীনকে।

প্রথম ছ'দানে টাকা ধরবার রীতি নেই। রীতি ? রাণু নিজের মনেই হাসলে। এ রীতি তো সেই তৈরী করেছে।

খেলা চললো। ছ'খানি ক'রে তাস পাবে দু'জনেই ; প্রত্যেক সাহেব বিবি বা গোলামের জন্যে পাঁচ টাকা।

প্রথম ছ'দান সুধীনই জিতলো। জিতলো, না জিতিয়ে দিলো রাণু, বিশ্বাস বাড়াবার জন্যে ?

পরের দান সুরু হ'ল।

সুধীন জানে সে জিতবে। আগ্রহে অধীর তাই। কিন্তু তাস তুলতে হাত কেঁপে উঠলো না কেন রাণুর ? সে তো শুধু টাকাই হারতে বসে নি, তার সর্বস্ব যে যেতে পারে। সুখ, শান্তি, সংসার।

না, রাণু জিতেছে। চমকে উঠলো সুধীন, ঝাপসা চোখে কি যেন চিনতে পেরেও ঠিক বুঝতে পারছে না।

আবার খেলা চললো।

রাণুর হাত কাঁপছে না। ও জানে, ও জিতবেই।

আবার।

হ্যাঁ রাণুই জিতেছে। রক্তের বিষ যেন এক এক ধাপ নেমে আসছে তার শরীর থেকে।

ক্রমাগতঃ পর পর প্রত্যেকটি দান জিতে চলেছে রাণু।

—আর খেলবে ?

চমকে চোখ তুললো সুধীন। চারপাশে তাকালে অনুবীক্ষণ দৃষ্টিতে। ভোর হয়ে এলো বুঝি। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

আর এক দান হেরে যেতেই উষ্ণ উন্মাদনার রক্তটুকু যেন তর তর করে নেমে গেল ওর শরীর থেকে। সহজ হয়ে এলো ও। স্বাভাবিক হয়ে এলো। হাস্যকর পরিবেশটার দিকে তাকিয়ে লজ্জার হাসি হেসে বললে, দূর, শোবে এসো। তাস খেলে কেউ রাত জেগে ?

হাঁফ ছাড়লো রাণু। আনন্দে আর খুশীতে সজল চোখজোড়া চকচক-করে উঠলো।

বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো সুধীন। আর নির্ভাবনার নরম আঙুলে তার চুলের ভেতর দিয়ে কাঁকুইয়ের মত ধীরে ধীরে শ্রান্তির স্বেদ মুছে নিলে রাণু। আরামের অনুরণন ফোটালে স্বামীর মুখে।

স্বস্তি !

পায়ের তলায় লুকিয়ে রাখা গোলাম চারখানা প্যাকেটে পুরে রাখলো রাণু। নিজের মনেই হাসলো।

হ্যাঁ, সুধীন ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তিতে, ক্লান্তিতে।

পরের দিন রাতের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেললো রাণু। সত্যি, এ কেমন ধারার লোক ও বুঝে উঠতে পারে না।

দিব্যি সুস্থ মনের মানুষ, হাবেভাবে কথায় বার্তায় এতটুকু টাল বেটাল নেই। অথচ, কেন যে মাঝে মাঝে এমন হয়! এ রহস্যের হারানো চাবিটা কোনদিনই হয়তো খুঁজে পাবে না ও।

হাসলো রাণু, কিন্তু হাসির পাশে পাশেই আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল। ভাবলে, ভগবানের কোন অভিশাপই হয়তো বা।

বিয়ের পর কত কত বার তো এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কত না উন্মাদ মুহূর্ত্তের বিভীষিকা দেখেছে ও, দাঁড়িয়েছে সামনা সামনি, না-জানা রহস্যের চোখে চোখ রেখে।

বহুদিন পর্য্যন্ত ওর ভাগ্যের দুর্বল দিকটা গোপন করে রেখেছিল ও। তারপর আশা আর আশঙ্কায় দুলতে দুলতে একদিন জানিয়ে ফেললো সব, মেয়েদের পরম বন্ধু আর নিরাপদ আশ্রয় যে সেই মা'র কাছে।

শুনে গালে হাত দিয়ে বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়েছিল মা, স্পষ্ট মনে আছে ওর। কান্না আটকে যাওয়া গলায় বলেছিল, সে কি রাণু! জুয়া? জুয়া খেলে ও?

ওর সামনেই মা অনুযোগ করেছিল বাবার কাছে।—শেষে জুয়াড়ীর হাতে মেয়েটাকে ফেলে দিলে তুমি? খোঁজ খবর নিতে পারো নি ভাল করে?

লজ্জায় তখন কান লাল হয়ে উঠেছে ওর। কি করে গুছিয়ে বলবে সব কথা, কি করে বলবে যে নেশা নয় সৌভাগ্যের পিছনে শাস্তির অভিশাপ।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লজ্জায় মুখ তুলতে পারেনি ও। তাই দূরে সরে এসে চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

ওর ধারণা, এও এক ধরণের রোগ হয়তো। চিকিৎসা করলে

সেরে যাবে। তাই কান্নার ভাষা দিয়ে লিখেছিল মাকে।

তবু সুযোগ সুবিধে হয়ে ওঠে নি এতদিন। সুধীনের বাবা মহাদেব বাবু কোলকাতায় বদলি হয়ে আসতেই, রাণু ভেবেছিল, নিজেই লিখবে, লজ্জার মাথা খেয়ে। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না। সুধীনকে লেখা ছোট চিঠিটার গোটাকয়েক লাইনঃ বুড়ো হয়েছি, ক'দিন বা বাঁচবো, এসময়ে যদি তোমরা কাছে থাকতে!

বাবার চিঠি পড়ে সুধীন বলেছিল, দুঃখ করে লিখছেন। চলো, মেলা শেষ হলেই কোলকাতায় যাবো।

অর্থাৎ সুধীন কিছুই টের পায় নি। টের পাবার কোন ইঙ্গিতও ছিল না চিঠিতে। তবু রাণুর বুঝতে দেরী হয় নি।

নিশ্চয় বাবা জানিয়েছেন সব ব্যাপার, তাই এমন জরুরী ডাক এসেছে শ্বশুরের কাছ থেকে। বাবা জানিয়েছেন তাই, তা না হ'লে রাণু নিজে থেকে কোনদিন বলতে পারতো না।

চিঠি পাওয়ার পর থেকে বেশ খুশিতে ভরে উঠেছিল ওর মন। আশা আর সাফল্যের মধ্যে কোন তফাৎই নেই যেন। ডাক যখন এসেছে, তখন একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। সেরে উঠবে সুধীন, ওর শরীরের রক্ত থেকে ঝরে পড়বে বিষাক্ত কণিকাগুলো।

ক'টা তো মাত্র দিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে মনসাপূজোর মেলা।

তারপর।

কিন্তু এরই মধ্যে এমন বিপত্তি আবার ঘটতে পারে ভাবে নি রাণু। ভাবে নি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্তের সব শপথ ভুলে গিয়ে সুধীন নেশার হাতছানিতে সাড়া দেবে।

অথচ, কি আশ্চর্য্য। দিনের বেলায় কত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে

মানুষটাকে। রাতের কথা মনে পড়তেই হাসি পেল ওর।

এমনি কৌতুকের হাসি হেসেছিল প্রথম যেদিন সেই রেলের উপনগরে, বিশ্রামশয্যায় কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল সুধীন।

অবিশ্বাসের হাসিতে লুটিয়ে পড়েছিল রাণু।

তারপর কতদিন যে কেটে গেছে!

মা বাবা ভাই বোন—সেই ছোট্ট রেল কলোনীটার কথা মনে পড়লো রাণুর। কলিকের ব্যথাটা কি সেরেছে? কে জানে। কৈশোরের সেই মন হারানো পৃথিবীতে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় রাণুর। শম্ভূ আর ভোলাকে দেখে নি কত দিন। মুন্না হয়তো ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। কে যেন বলেছিল, শহরটা বদলে গেছে একেবারে। উত্তর দক্ষিণে বেড়ে গেছে অনেকখানি। আচ্ছা, পোর্টারঘুলির পাশ দিয়ে কি এখনো ট্রেণ যায় হুস্‌হুস্ করে? ছোটবেলার মতই কি এখনো মাঝরাতের হুইস্‌ল শুনে ঘুম ভেঙে যাবে? শনিবার ভোরে কি ইস্কুলের ছেলেরা তেমনি সারি বেঁধে গান গাইতে গাইতে যায় রাস্তা দিয়ে? দুর্গামন্দিরের চত্বরে থিয়েটার হয় পূজোর সময়, রাত জেগে দেখে সবাই? কত কথাই না মনে পড়ে, কত ফেলে আসা দিন নতুন করে মনে পড়ে।

ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কখন রাণুর চোখ জোড়া এসে থামলো আকাশের গায়ে।

একটা গাংশালিক নেমে আসছে। হয়তো পিছনের ঐ শঙ্খচিলটার ভয়ে।

দীর্ঘশ্বাস বললো, ছোট বেলাকার দিনগুলো কত রঙিণ ছিল, রামধনুকের মত। আর কি সুন্দর সেই পৃথিবী।

শহরের পিঠে মেরুদণ্ডের মত পূবে পশ্চিমে গেছে রেলের লাইন। উপনগরের অর্দ্ধেকটা রেললাইনের উত্তরে, বাকী অর্দ্ধেক দক্ষিণে।

সারি বাঁধা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। রাস্তার দু'পাশে একই ধরনের, এক মাপের কোয়াটারের রেঞ্জ। লাল কাঁকরের ধুলো-ওড়া রাস্তা। দূর-ভাসা মালগাড়ীর সান্টিংএর আওয়াজ।

শঙ্খচিলটার মতই যেন ওপরে উড়তে উড়তে শহরটা দেখতে পাচ্ছে রাণু। টালির ছাদ, কেবল অসংখ্য টালির ছাদ সারা সহরটা জুড়ে। কোন এক সৈন্য শিবির যেন। মন্দির, ইস্কুলবাড়ী, সিনেমা হল, গির্জ্জা। কাঁটাগাছের বেড়া বাগানের চারপাশে।

নিজেদের সেই ছোট চার নম্বরের কোয়ার্টারটা চোখে পড়ছে সবচেয়ে বেশি। ভক্তি আর মায়া, তার পড়শি আর ইস্কুলের বান্ধবী। ওরা এসেছে ফুল কুড়োতে। বাগানের পূব কোণে ঝরা-শিউলিতে ভরে গেছে, আর কি মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে ভেসে।

কটা বছরই বা পার হয়েছে! সব মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

সেই বিয়ের রাত, ফুলশয্যার রাত, আরো তো কত রাত কেটে গেল। মাচন্দার ভিটেতে নতুন সংসার পত্তন হ'ল। কত আনন্দ আর আশা। সুখ আর ঐশ্বর্য্য।

তারপর ক্রমশঃ সব মুছে দিয়ে গেল একটি মাত্র আশঙ্কা। সব প্রজাপতি উড়ে গেল।

—আচ্ছা, কেন এমন হয় বলোতো? বারবার এ প্রশ্ন করেছে রাণু, সুধীন জবাব দিতে পারে নি।

কি করেই বা দেবে। ও নিজেই কি ছাই জানে! শুধু সন্দেহ, হ্যাঁ একটা সন্দেহ উঁকি দেয় মাঝে মাঝে। অতীতের ভুলে যাওয়া একটুকরো ইতিহাস। রহস্যের চাবি কি সেখানেই?

নিজের মনকেও বহুবার এ প্রশ্ন করেছে সুধীন।

মাচন্দার হাটে মনসাপূজোর মেলা মিইয়ে গেলো।

বাইরে থেকে এসেছিলো যারা একে একে ফিরে চলেছে। চওড়া কাঁকরের রাস্তা, মাঝখানে হাত তিনেক শুধু পীচ ঢালা। দু'পাশে ধুলোর পাড়, মুচকুন্দ আর অর্জ্জুন গাছের ছায়ায় ছাওয়া। আর ঐ সড়কের ওপর দিয়েই গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে সারি বাঁধা গরুর গাড়ী। মাল বোঝাই কোনটায়, কোনটা বা ছাউনী আঁটা।

সুধীন আর রাণুও চলেছে। দূর শহর কোলকাতার উদ্দেশে।

ছাউনীর বাঁশে বারবার মাথা ঠোকে রাণুর। এর চেয়ে হেঁটে যাওয়াও বোধহয় সুখের হ'ত। কিন্তু পথ যে অনেকখানি! নীচে খড় বিছিয়ে নিয়েছে, ওপরে পেতেছে একটা কম্বল। তবু বড়ো অস্বস্তি লাগে। ছাউনীর পিছন দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে মালপত্র, বিছানা বাক্সয়। একটু যা ফাঁক তারই ভেতর দিয়ে নিষ্পলক চোখ মেলে রেখেছে ও, পিছনের পথে।

বাঁশ ঝাড় আর বটপাতার আড়ালে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গ্রামটা। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে রাণু।

সুধীনও চুপ করে বসেছিল এতক্ষণ।

হঠাৎ বললে, কি ব্যাপার বলো তো? আমি তো ভেবেচিন্তে কোন কুল কিনারাই পাচ্ছি না।

ঠোঁট টিপে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলে রাণু। বললে, আমিই কি জানি? কারও অসুখ বিসুখ না করলে বাঁচি।

চিন্তিত মুখে সুধীন বললে, তামিও তাই ভাবছিলাম।

রাণু চুপ করে রইলো। ব্যাপারটা ও খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে। কিন্তু প্রকাশ করবার সাহস নেই।

নিজের চিবুকের ওপর আঙুলের টোকা দিতে দিতে সুধীন বললে, বাবা তো বড়ো একটা এ ধরণের চিঠি লেখেন না। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট্ করে যেতে বললেন, অথচ কেন তা লিখলেন না!

রাণু মৃদু হেসে বললে, এত ভাবছো কেন, আর তো ঘণ্টা কয়েক পরেই বুঝতে পারবে।

সুধীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হুঁ।...কিন্তু...কে জানে!

রাণু অত ভাবে না। খানিকটা আন্দাজ করতে পারে ও। আসলে ওর সেই চিঠির ফলেই সুধীনের ডাক পড়েছে। বেশ বুঝতে পারে ও। যাক্, এবার যদি একটা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠ আর মাঠ। এখানে ওখানে ছড়ানো গাছগুলো দুরের দৃষ্টিতে মনে হয় যেন একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনের মত দেখায় দূর থেকে। মেঠো পুকুরটার পাড়ে বাঁশবন, তারও ওপরে, অনেক দূর দিয়ে বৃত্তার্ধের মত ঘুরে এসেছে রেলের লাইন।

ষ্টেশনটা অনেক কাছে এসে পড়েছে।

দূরের দিগন্তে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আকাশে কেঁপে দুলে উঠলো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। রাণু বলে উঠলো, ট্রেণ যে এসে গেল!

কথাটা হয়তো কানে গেল ছিদামের। বলদ দুটোর পিঠে দু'ঘা পাঁচন কষিয়ে জিভ মুড়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বললে, আমরাও তো পৌঁছে গেলাম বলে। টেশেন এলো ব'লে, বৌঠান্।

হ্যাঁ. টেণ আসবার অনেক আগেই প্লাটফর্মে এসে পৌঁছলো ওরা।

খোলা প্লাটফর্ম, ওপরে ছাউনী নেই, কড়া রোদ মাথায়, আর কড়কড়ে

কাঁকর পায়ের নীচে। ষ্টেশনটা খুব ছোটই, কিন্তু এর মধ্যেই, লোক জমেছে কম নয়। হয়তো বেশীর ভাগই মাচন্দা-ফিরতির। মেলার শেষে ফিরে চলেছে। মালপত্তর সব একপাশে রেখে সুধীনও গেল টিকিট কাটতে।

রাণু দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। দেখছিল যাত্রীদের জনতা। নানা-রকমের ভাঙা টুকরো আওয়াজ, ছাড়াছাড়া কথাবার্তা। দৌড়োদৌড়ি, ছুটাছুটি।

হঠাৎ অদূরের যাত্রীদের দিকে চোখ গেল ওর। মেয়েটির বেশ-বাসের বিশিষ্টতা এমন গ্রাম্য-ষ্টেশনের মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন।

কয়েকটা ট্রাঙ্ক, সুটকেশ আর বেডিংকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটি পুরুষ আর মেয়ে। একটি সম্পূর্ণ পরিবার। কিন্তু, ওদের সকলের মধ্যে একটি মেয়ের দিকেই বারবার চোখ যায় ওর।

চমৎকার দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। শহুরে রীতিতে আঁটসাঁট করে পেঁচিয়ে পরেছে সে কালো সিল্কের সাড়ীখানা। ছিপছিপে দোহারা দেহলতা, সুডোল হাতের কাঁধের দিকটা সাদা ব্লাউজের আঁটবাঁধুনিতে ওর সহজ স্বাস্থ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি খুব ধীর পায়ে একবার লাইনের কাছে এগিয়ে আসছে, আবার ফিরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মুখে বিষন্নতার ছায়া, দেহে কিছুটা বা ক্লান্তি। তবু, কেমন যেন এক সরল মাধুর্য মেয়েটির চোখেমুখে। রাণুর হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল ওর সঙ্গে আলাপ করতে। অপরিচিত অনেকের সঙ্গেই আলাপ করেছে রাণু, নিজে সেধে ট্রেণের কামরায়, ওয়েটিং রুমে পূজোর মণ্ডপে। কিন্তু। না, বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ওরা, মালপত্র

ফেলে রেখে এতখানি যাওয়া উচিত হবে না।

মেয়েটি হয়তো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে এসে এবার সে বসলো একটা বেডিংয়ের ওপর। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে। চিবুকটিকে তিনটি আঙুলের আশ্রয়ে রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে, দূরের দিগন্তের দিকে।

নুড়ি পাথরের সরু বীথিপথ, দুধারের শ্যামল ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে নেমে এসেছে সুস্পষ্ট সিঁথির মত। আর তারই ওপর দিয়ে একজোড়া সমান্তরাল চিকচিকে ইস্পাতের পাত।

হঠাৎ কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রাণু। সুধীনের কথায় চোখ ফেরাতে গিয়ে চোখ পড়লো মেয়েটির দিকে। একদৃষ্টে তার দিকে বিস্ময়ের চোখ মেলে রয়েছে মেয়েটি।

রাণু প্রশ্ন করলে, ওকে চেনো? ঐ যে বসে রয়েছে?

ফিরে তাকালো সুধীন। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলে মেয়েটি।

সুধীন হেসে বললে, তোমার মত মিথ্যেবাদী আর একটি নেই।

কেন, মিছে কথা আবার কখন বললাম?

বরং বলো, মিছে কথা আর কখন্ না বলি?

রাণু হাসলে।—বেশ তাই, যা জিগ্যেস করলাম সেটার আগে জবাব দাও তো।

সুধীন বললে, শোনা কথাকে বেমালুম নিজে দেখেছি বলাটা সত্যি নয় নিশ্চয়?

—নয়ই তো।

সুধীন হেসে উঠলো আবার।

বললে, ঐ তো সেই কোলকাতার মেয়ে, যার বদনাম রটাতে তুমি

একেবারে সিদ্ধহস্ত।

রাণু হেসে বললে, ঐ নাকি? পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, না বাপু সত্যি মেয়েটি তা হ'লে ভালো। কি সুন্দর ছেলেনানুষ ছেলেমানুষ মুখখানা দেখেছো?

সুধীন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটা হৈ চৈ হাঁক ডাক সুরু হয়ে গেল। ট্রেণখানা চোখের দৃষ্টিতে দেখা গেছে। থানার বাঁকটা ঘুরে এখনি এসে পড়বে। সিগন্যালের পাখ্‌নাটা ঝুলে রয়েছে।

ছিদামকে ডাক দিলে সুধীন, জিনিষগুলো ঠিক আছে কিনা আর একবার গুনে দেখে নিলো। ট্রেণখানাও এসে পৌঁছলো ইতিমধ্যে।

পুরুষদের কামরাগুলোয় ভিড় দেখে রাণু বললে, মেয়েদের গাড়ীতেই যাই না। তুমি ঐ পাশেরটায় হয়তো জায়গা পাবে।

সুধীন এদিক ওদিক ঘুরে এসে বললে, হ্যাঁ, সেই ভালো।

ইন্দিরারা যে কামরাটায় উঠলো সেইটেতেই রাণুকেও তুলে দিলো সুধীন। অন্যগুলোর চেয়ে ওটা তবু খালি। নিজে গিয়ে উঠলো পাশের একটাতে। ট্রেণ ছেড়ে দিলো।

ছোট লাইনের গাড়ী। ফিটনের মত ধীরমন্থর গতিতে চলেছে ট্রেণখানা। ইন্দিরা কৌতুকে উছলে উঠলো আলাপটা একটু অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতেই। হেসে বললে, আমার সঙ্গে কিন্তু ওঁর ঝগড়া হয়ে গেছে একচোট।

রাণুও হাসলে।—তাই নাকি?

ইন্দিরার মা মেয়ের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, দুনিয়াসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে জুড়ি নেই আমার মেয়ের।

ইন্দিরা আদুরে মেয়ের মত মুখভঙ্গী করলো।—জানতাম না তাই।

আরও ঝগড়া করতাম তাহ'লে। মা একবার দেখেই বললে, সুধীনের মত মনে হচ্ছে। সেই কোন দশ বছর আগে দেখেছিলেন, তবু ঠিক চিনতে পেরেছে দেখেই, আর উনি একবার ফিরেও তাকালেন না।

রাণু বললে, আচ্ছা বোকা মেয়ে তুমি বাপু। ফিরে তাকায় নি বলেই তো চিনতে পারে নি।

ইন্দিরা বললে, এখন নয় দেখেননি, কিন্তু সেদিন মেলার মাঝখানে অতক্ষণ ধরে তর্ক হ'ল, কৈ আমাকে চিনতে পেরেছিলেন ?

ইন্দিরার মা হেসে বললেন, দেখো মেয়ের কাণ্ড। সুধীনের ওপর রাগ, ঝগড়া করছে তোমার সঙ্গে।

তারপর ইন্দিরার দিকে ফিরে বললেন, তাছাড়া, তোকে চিনবেই বা কি করে, তখন তো ছোট্টটি ছিলি, আজ দশ বছর পরে দেখেই চিনতে পারবে তোকে ?

ইন্দিরা কপট রোষে বললে, বাঃ রে, তুমিও তো দশ বছর আগেই দেখেছো।

—তা ঠিক্, কিন্তু সুধীন তো আর তেমন কিছু বদলায় নি, তুই যে এদিকে বড়ো হয়েছিস কত।

প্রত্যুত্তর খুঁজে না পেয়ে ইন্দিরা বললে, দাঁড়াও না, বড়মামা এবার এলে বলবো। ভারী তো কচু, চিনতেই পারে না।

ইন্দিরার ভাবভঙ্গী দেখে রাণু না হেসে পারলো না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

ইন্দিরার মা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সুধীনের মাঝে কি মাথার গোলমাল হয়েছিল শুনেছিলাম ?

—মাথার গোলমাল ? বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো রাণু। তারপর উচ্ছসিত হাসিতে ঢলে পড়ে বললে, তা বোধ হয় একটু আছে ওঁর।

কি বলো ইন্দিরা? রাস্তায় ঘাটে যখন তোমার মত মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে!

ইন্দিরার মা অপ্রতিভ হয়েছিলেন প্রথমটা। একটু সহজ হেসে বললেন, সত্যি নয় তা হ'লে? গাঁয়ের লোকগুলোও এমন। বছর কয়েক আগে কে যেন বলেছিল, সুধীনের মাথার গোলমাল হয়েছে। আমি তো—

রাণু সচেষ্ট হাসি টেনে এনে বললে, শত্তুরের তো অভাব নেই গাঁয়ে। যার যা খুশী বলবেই।

—আমিও তো তাই বলি বৌ, লোকগুলোর কি এতটুকু হায়া নেই? বলে কিনা পাগল হয়ে গেছে, প্রাকটিশ ছেড়ে দিয়েছে।

ইন্দিরা বললে, রাজেন আচার্যি সেবারে 'মোষ পাগলা ডাক্তার' বলেছিল ওঁকেই নাকি?

ইন্দিরার মা কথাটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন, তাই চটে উঠলেন। তুই চুপ কর তো, সব কথায়—

রাণু হাসলে।—ইন্দিরা ঠিকই বলেছে, গাঁয়ের অনেকে ঐ নামেই ডাকে ওঁকে।

—কেন রাণুমামীমা? সহানুভূতির স্বরে ইন্দিরা প্রশ্ন করলে।

রাণু বললে, ডাক্তারি পাশ করে হঠাৎ প্রাকটিশ ছেড়ে দিয়ে চাষবাসের দিকে মন দিয়েছিলো তাই। চাষের দিকে ওর এমন নেশা, খাওয়াদাওয়া ভুলে যায়। কোথায় কোন হাটে ভালো মোষ বিক্রি আছে, ছুটবে। মানুষ মরে যাচ্ছে শুনলেও একবার যেতে চাইবে না, অথচ দু'বেলা মোষগুলোর ঠিক্ যত্ন হচ্ছে কিনা দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে। তার তেল মালিশ চাই, খোল খাওয়ানো চাই ওজন করে, পাঁচ মিনিট বেশি খাটতে পারবে না জমিতে—

ইন্দিরার মা বললেন, এই না হ'লে চাষ হয় বৌ? ছোটবেলায় দেখেছি, গরুর জন্যে ছোলা আনাতেন বাবা গাড়ী গাড়ী। এই বড় বড় দানা, অথচ এক মুঠো কেউ বাড়ীতে রাঁধতে পারবে না। বলতেন দরকার হয়, দোকান থেকে আনিয়ে নাও।

ইন্দিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলো। বললে, চুপ করো বাপু, তোমাদের গরু মোষের গল্প থামাও।

রাণু হেসে বললে, শিখে রাখো, পরে কাজে লাগতে পারে।

ইন্দিরা জবাব দিলো না, নাক কুঁচকে বললে, পাড়াগেঁয়ে বর? মরে গেলেও না। ইন্দিরার মা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই প্লাটফর্মের ভেতর ঢুকলো ট্রেণখানা।

মোটঘাট নামিয়ে নিয়ে ইন্দিরাদের বাড়ীর সকলে এক পথ নিলো, রাণু আর সুধীন অন্যপথ। কিন্তু দু'পা গিয়েই ফিরে এলো ইন্দিরা।

—রাণুমামীমা। বাঃ রে, কোলকাতার বাসার ঠিকানাটা দিয়ে যান।

সহাস্যে ঠিকানাটা জানালো ও। প্লাটফর্মের থামটার গায়ে একটুকরো কাগজে সেটা লিখে নিলো ইন্দিরা, নিজেদের ঠিকানাটা লিখে দিলো।

বললে, হারাবেন না, আসবেন কিন্তু একদিন।

হেসে ঘাড় নাড়লো ও। বললে, যাবো। তার আগে তুমিই-এসো না একদিন? কোলকাতার মেয়ে তুমি, পথঘাট চিনে একাই তো আসতে পারবে, আমার তো ভাই পরভরসা!

ইন্দিরা হাসলো, তারপর সুধীনের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বললে, ট্রিকটাও গিয়ে জেনে আসবো কিন্তু!

ইন্দিরাকে চট্ করে ভুলতে পারলো না রাণু। সারা রাস্তাটা ভাবলো। বহুদিন পরে কোলকাতার বাতাসে স্নান করে নিলো রাণু। কোলকাতা!

এখানেই মানুষ হয়েছে ইন্দিরা। কি চমৎকার মেয়ে!

সন্ধ্যে উতরে রাতটা বেশ একটু ঘন হয়ে এসেছে তখন। কার্জন পার্কের ধার ঘেঁষে এসে চৌরঙ্গীতে পড়লো ট্যাক্সিখানা। খাঁচা-পালানো পাখির মত উৎসুক চোখে চারপাশের পৃথিবীতে চোখ বুলিয়ে চললো রাণু। হঠাৎ যেন ওর বয়সটা অনেক কমে গেছে। ছোট্টবেলার সেই কিশোরীটির মত জেগে উঠলো যেন। সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে রাজকন্যে যেমন জেগে ওঠে নিশীথতন্দ্রার আবেশ কাটিয়ে।

—ইন্দিরা মেয়েটা বেশ, না? হঠাৎ প্রশ্ন করলো।

একবার সুধীনের কাঁধ ঘেঁষে সরে আসে ও, আবার পরক্ষণেই চলে পড়ে কোনের দিকে। জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দেখে শহরের মুখর-কাকলি। আলোর প্লাবন।

পথচারির সংখ্যা এদিকে ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। ওপরে ঘন অন্ধকার আকাশ, নীচে উজ্জ্বল আলোর তরঙ্গ। কি যেন একটা বিজ্ঞাপন জলছে আর নিভছে।

রাণু হঠাৎ বললে, হ্যাঁ গো, এই নাকি কোলকাতা? এর চেয়ে আমাদের মেলায় অনেক বেশি লোক থাকে?

সুধীন হাসলো। বললে, রাত তো কম হয়নি, তোমার জন্যে কি সকলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না কি।

সুধীন কি বললে না বললে সেদিকে কিন্তু কান থাকে না ওর। ও প্রশ্ন করেই খালাস, বলতে হবে একটা কিছু কারণ ওর মনে ফুর্তি জেগেছে। উত্তর শোনবার জন্যে কথা বলা নয়, কথার জন্যে কথা।

চলন্ত বাসটা ধরবার জন্যে লোকটা ছুটতে ছুটতে হাল ছেড়ে দিলে। ব্যর্থ চোখে তাকালো, পিছনে কোন বাস আসছে কিনা। রাণু তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো। যেন কত বড় কৌতুক!

—দেখলে, মজা দেখলে! হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সারা রাস্তাটা নিওনের আলোয় ঝকমক করছে, জলে ভাসা তিমির পিঠের মত দেখায় পীচের সড়ক। আর দূরের অন্ধকারে লাল নীল পীতাভ আলোর সঙ্কেত বাতি। টুকরো টুকরো আওয়াজ ভেসে আসে, বিদায়লগ্নের শুভেচ্ছা জানায় কেউ হাত তুলে, খুটখুট খুটখুট শব্দ তুলে উঁচু হীল্ জুতোর পদধ্বনি বাজে। একাকিনী চলেছে একটি পূর্ণ যৌবনা মেম।

কপট আতঙ্কের ছায়া আনে রাণু। চোখমুখে।

বলে, বাবাঃ, আমি হলে, কিন্তু ওর মত একা যেতে পারতাম না এই রাত্তির বেলায়। ভয়েই মরে যেতাম।

—কার মত? সুধীন প্রশ্ন করে।

উত্তর না দিয়ে রাণু বলে, কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, আর একটু জোরে চালাতে বলো না।

নরম গদি-আঁটা আসনে শরীরটা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডা বিপরীত বাতাসে কপালের কাছে খুচরো চুলগুলো উড়তে থাকে, দুলে ওঠে রেশমী সাড়ীর ভাঁজগুলো।

—উঃ রাস্তা কি শেষ হবে না! হঠাৎ বলে ওঠে রাণু।

সুধীন হাসে, জবাব দেয় না। ও বুঝতে পারে রাণুর মধ্যে একটা নতুন মানুষ ঢুকেছে। মুক্ত বিহঙ্গের মত তাই পাখা ঝটপট করতে সুরু করেছে ও।

শহর দক্ষিণের জনবিরল পথ ধরে' ছুটে চলেছে গাড়ীখানা। ক্লপ ক্লপ্ শব্দ করে একটা ফিটন চলেছে। চকিতে আরোহীদের দিকে তাকালো রাণু। সক্ষমদেহ একটি পুরুষের আলিঙ্গনে একটি মেয়ে।

—মাগো! রাণু বলে উঠলো, লজ্জা করে না? তা নইলে আর

শহুরে মেয়ে বলে !

ফিটনটা পিছনে পড়ে থাকে। সামনের কোন বাড়ী থেকে ভেসে আসে রেডিওর গান। কথাগুলো বোঝা যায়না, কিন্তু সুরটা বেশ মিষ্টি লাগে রাণুর।

আচ্ছা, নীলা তো গানের ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে, ও বোধহয় খুব ভাল গান গাইতে পারে, না ?

সুধীন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, হুঁ।

—নীলারা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ, না ?

—কি জানি !

—ওরা যা আশ্চর্য হবে, না জানিয়ে এসে পড়লাম।

—হুঁ।

ওর মনের উচ্ছলতাকে কোন রকমেই যেন চেপে রাখতে পারছে না রাণু। অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরন অনুভব করছে মনেপ্রাণে, অপূর্ব এক আবেগ। হঠাৎ-জাগা ঝর্ণার মত ফেটে পড়তে ইচ্ছে হয় ওর। কথা। শব্দ। কথা বলে নিজেকে হাল্কা করতে চায় যেন।

সুধীন একসময়ে বলে, কি ছেলেমানুষি করছো !

বিরক্তির ধমক শুনে হঠাৎ চুপ করে যায় রাণু। অভিমান আহত বিষণ্ণতায়। বাকি রাস্তাটা আর একটাও কথা বলে না।

ট্রাম লাইন ছেড়ে বড় রাস্তা, বড় রাস্তা থেকে ছোট সড়ক, তারপর অন্ধ গলিতে এসে পৌঁছল ওরা, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে।

রাণু শুধু বললে, তখনি বলেছিলাম একটা চিঠি দিয়ে দাও। ষ্টেশনে কেউ যেত একজন।

সুধীন হেসে জবাব দিলো, আজই নয় তোমার স্বামী মুনিষ রাখালের পেছনে ঘুরে বেড়ায় গো, আট দশ বছর আগে এই শহরেই কাটিয়ে গেছে

সে এককালে, ভুলে যাও কেন।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চাপা ঠোঁটের প্রান্তে এক টুকরো হাসির ঝিলিক ছিটিয়ে রাণু বললে, হুঁ, তাই পাঁচজনকে জিগ্যেস করতে হ'ল একটা গলি খুঁজে বের করতে।

রাণুর সঙ্গে তর্কে কোনদিনই পারে না সুধীন। ঠিক যে তর্কে পারে না, তাও নয়; আসলে অত গুছিয়ে কথা বলতে পারে না ও, ধৈর্যও থাকে না। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, দোষ হয়েছে, মাফ করো। আর বলবো না কোনদিন।

একটা পার্কের সামনে এসে শেষ হয়েছে গলিটা। নিঝুম অন্ধকার। সবুজ ঘাসের লনে পা মাড়াবার লোক নেই, নির্জন। ঝিঁঝিঁগুলো তাই বোধহয় গলা সাধবার সাহস পেয়েছে। আর, কোথাও কোন শব্দ নেই। নম্বর মিলিয়ে একটা ভাঙা পুরোণো বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামাতে বললে সুধীন। গাড়ী থেকে নেমে চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো। সারা গলিতে একটা লোক নেই, দূরের গ্যাসপোষ্টের নীচে একটা ভিখিরি বসে আছে। বসে বসে কাপড় শুকোচ্ছে মনে হ'ল।

বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লো সুধীন। দু'তিনবার কড়া নেড়েও কোন জবাব পেল না ভেতর থেকে। শুধু কাঁসার বাসনের ঠুংঠাং একটা আওয়াজ কানে এলো। আর চাপা কান্নার। কে যেন একটা ধমক দিয়েই চুপ করে গেল।

এবারে বেশ একটু জোরে আর বেশ কিছুক্ষণ ধরে কড়া নাড়লো সুধীন। একটু রাগের বশেই হয়তো বা।

ভেতর থেকে ধমকের স্বরে প্রশ্ন এলো, কে?

প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল সুধীন। গলার স্বরটাও ঠিক চেনা মনে হ'ল না। কিন্তু নম্বরটা মিলিয়ে দেখলে ভুল হয়নি মোটেই।

ভাঙা গলায় ডাকলে, শুনুন।

—তবে রে হারামজাদা!

মচমচ শব্দ ক'রে ভারী জুতোর পদধ্বনি এগিয়ে আসছে শুনতে পেলো সুধীন।

—ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাতে-বেড়াতে তোমার লীলা করতে আসা বের করছি। কর্কশ গলায় ভেতর থেকে পূর্বোক্ত লোকটিই বললে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই চাপা মেয়েলি স্বরে ভীতচকিত সাবধানী এলো, আঃ, কি হচ্ছে কি? কে না কে ডাকছে, দেখই না দরজা খুলে।

—ওঃ, কে না কে! কিছু জানেন না, ভিজে বেড়ালটি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

বেত্রাঘাতের শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার এলো কানে।

সুধীন ঘেমে উঠলো। আশ্চর্য!

সাহসে ভর করে ডাকলো, শুনছেন। একবার আসবেন এদিকে।

কিন্তু কে জবাব দেবে।

আবার বেত পড়লো সপাং করে। 'উঃ' বলে চিৎকার করে উঠেই নরম মেয়েলি গলার অনুরোধ।—আঃ, দেখই না দরজাটা খুলে, কেউ এসেছেন বোধহয় তোমার কাছে।

—আমার কাছে? তাই তো বলবে এখন। কার টানে এসেছে তা তো এ শর্ম্মার জানতে বাকী নেই।

সুধীন চলে আসবে কিনা ভাবছিলো, হঠাৎ খুট করে খিল খোলার শব্দ হতে হু'পা পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলো ও। পরক্ষণেই খোলা কপাটের ফাঁকে দেখলে একটি বীভৎস মূর্তি।

ছ'ফিট লম্বা বিরাট স্থূল চেহারার একটি লোক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে

তাকালো ওর দিকে।

সুধীন কোন রকমে জিগ্যেস করলো, মহাদেববাবু, মহাদেব ভঞ্জ নামের কেউ থাকেন এখানে?

উত্তর এলো, না! না! জানি না। বেশি পঁ্যাচ খেলাতে হবে না, ভাগো। হাড়গোড় ভেঙে দেব আর যদি কোনদিন এ বাড়ির চৌকাট মাড়াও! ভাগো হিঁয়াসে।

—আঃ, ছিঃ।

চকিতে ফিরে তাকালো সুধীন নারীকণ্ঠ লক্ষ্য করে। বিরাটকায় লোকটির আড়ালে একটি ছায়াশরীর। টানা ঘোমটার ফাঁকে অতি সুন্দর একটি ব্যথাতুর মুখে বিরক্তির ছায়া দেখতে পেল সুধীন। মুহূর্তে চোখাচোখি হতেই এগিয়ে এলো মেয়েটি।

বললে, হঁ্যা, থাকেন এখানে। ঐ দোতলায়।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিটার দিকে এতক্ষণে চোখ গেছে লোকটির। আর ট্যাক্সির কোনে বসা রাণুর দিকে।

মেয়েটির কথা লুফে নিয়ে সেও বললে, হঁ্যা থাকেন এখানে, ঐ সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা ওপরে যাবার।

নীলাদের ডাকাডাকি করে, লোকজন এনে মালপত্র তুলে দিয়ে রাণুকে ওপরে যেতে বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলো সুধীন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে একবার ফিরে তাকালো।

ঘোমটা-টানা বৌটির চোখের কোনে কি যেন চকচক করে উঠলো।

সুধীন আরও দু'ধাপ ওপরে উঠেছে, কানে এলো, যা ঘরে যা হারামজাদী। আজকের মত ছেড়ে দিলাম।

ইচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে তাকাতে পারলো না সুধীন।

পয়লা চোখে সুধীন আর রাণুর যাই মনে হোক্ না কেন, দিনের আলোয় বাড়ীটা মন্দ লাগে নি ওদের। দোতলায় প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঘরগুলোও নেহাৎ ছোট নয়। দক্ষিণের কোনে এককালি বারান্দা, একটা টবে তুলসীর চারা আর দুটোয় পাতাবাহার গাছ। আর বারান্দাটা, নীলা বলে পর্চ্, বেরিয়ে আছে গলির ওপর অবধি। রেলিং ঝুঁকে দাঁড়ালে তাই সারা গলিটাই নজরে পড়ে। আর নীলা রেলিং ঝুকেই দাঁড়িয়ে থাকে সারাটা দিন। অবশ্য ছুটির দিনে। অন্য দিনে তো ইস্কুলেই থাকতে হয় গোটা দুপুর। রাণু আর সুধীনের দিনগুলো বেশ অবসরের মধ্যেই কাটছিলো। বাড়ীটা সত্যিই ভালো, ছিমছাম।

মন্দ যেটুকু তা হ'ল মুখপাতে। নীচের তলার ঢোকবার রাস্তাটুকু ভাঙাচোরা, সুরকি আর শ্যাওলার জঞ্জাল। আর অসুবিধে, তিন চারটে পরিবারের লোককে আসা-যাওয়া করতে হয় একই সিঁড়ি দিয়ে। রাণু সে অভিযোগ করেও ছিল একদিন।

মহাদেববাবু উত্তর দিয়েছিলেন, ওসব কিছু না বৌমা, কোলকাতা শহরে অমন দু'একটা অসুবিধে হবেই। আসলে পাড়াটাই আমার ভাল লাগে না। পড়শিগুলো যদি একটু ভদ্র হ'ত।

রাণু বলেছিল, হ্যাঁ বাবা, যা দেখলাম সেদিন রাত্রে, দামী দামী কোট প্যান্ট পরে মচ্‌মচ্ করে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু একেবারে ছোটলোক।

সুধীন একটু দূরে বেতের চেয়ারে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে

খবরের কাগজ পড়ছিল। কথাটা কানে যেতেই কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, এক নম্বরের স্কাউণ্ড্রেল।

রাণু হয়তো লক্ষ্য করেনি সুধীনকে, কথা শুনে চট্ করে ঘোমটাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিলো। গলার স্বরটা অনেকখানি সংযত করে বললো, তা একটা ভাল পাড়া দেখে বাসা নিন্ না বাবা, নীলাটাও বড়ো হয়েছে।

মহাদেববাবু হেসে উঠলেন, বাসা কোথায় বৌমা, এইটে জোগাড় করতেই কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ?

রাণু বললে, হুঁ, নীলা বলছিলো বটে। তা অন্য পড়শিরা তো বিশেষ খারাপ নয়। এই লোকটাই যা—

সুধীন ওদিকে চেয়ার ছেড়ে ঘরের ভেতর যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, লোকটাকে তুলে দিতে পারলেও হ'ত। ব'লে ঘরের ভেতর থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে এসে বললে, বাড়ীআলা চেষ্টা করলে তো পারতো।

মহাদেববাবু উত্তর দিলেন, সে-চেষ্টা করবে কেন বাড়ীওয়ালা ? মোটা টাকা ভাড়া পায় যে ভাঙা ঘর দু'টোর জন্যে।

সুধীন বললে, লোকটা একেবারে ছোটলোক, হঠাৎ টাকা ফাকা পেয়েছে কিছু, বস্তি থেকে উঠে এসেছে।

শুধুই কি বললো ? ওর কেমন একটা ধারণাও জন্মেছিল, লোকটা নির্ঘাৎ কুলিমজুর ধরনের। মাতাল আর লম্পট। শুধু খট্‌কা লাগতো বৌটার মিষ্টিমুখখানা মনে পড়লেই। কে জানে, হয় তো চুরি ডাকাতি করেই এনেছে! অসম্ভব নয়, ভাবতো সুধীন। তারপর হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল।

সেদিন দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে রাস্তায় নামলো ওরা। সে রাত্রের সেই বিশ্রী ঘটনার পর এই প্রথম কাছাকাছি হ'ল। তাই সুধীন

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলো। চোখ তুলে ভাল করে তাকাতেও কেমন লজ্জা পেল। লোকটার কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালালো।

লোকটি কিন্তু সপ্রতিভ। সেদিনের কথাগুলো যেন ভুলেই গেছে। বললে, এত তাড়া কেন মশাই, আস্তে আস্তেই চলুন না।

বাধ্য হয়েই গতি মন্দ করতে হ'ল সুধীনকে। মুখে বললে, নাঃ, তাড়া নেই।

—আপনার সঙ্গে তো আলাপই হয় নি, অথচ একই বাড়িতে থাকি।

সামান্য একটু পরিচয় দিলো সুধীন। কিন্তু অত সহজে ছাড়বার লোক নয় ও।

—আপনার নামটা ?

নাম বললে সুধীন। নিজের নামটাও জানিয়ে দিলো লোকটা। ভগীরথ।

—কি করা হয় ? ভগীরথ জিগ্যেস করলে।

—এই চাষবাস করি, গ্রামে থাকি।

—বেশ বেশ, ঐ ভাল মশাই। সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। এই দেখুন না, ক্যালকাট ইউনিভার্সিটি থেকে বি এস্ সি পাশ করে একটা কেমিক্যাল ফার্মে চারশো টাকা মাইনের চাকরী করছি। চারশো টাকায় কি থাকে বলুন ? তাও নেহাত এমন চেহারাখানা ছিলো তাই সাহেবের নজরে পড়েছিলাম্। নইলে হয়তো একশো টাকায় ঘসতে হ'ত।

সুধীন বেশ একটু কৌতুক বোধ করলে লোকটির কথায়। বললে, হ্যাঁ, ও রকম চেহারা সত্যিই দেখি নি। তবে উন্নতি আপনার নিশ্চয় কাজের জন্যেই। কাজের কদর জানে সাহেবরা।

—তা ঠিক্‌ই বলেছেন। তবে আমরা মশাই যা সুখে আছি তার তুলনায় আপনারা বেশি পড়াশুনো না করে চাষবাস নিয়ে অনেক ভাল আছেন।

মনে মনে বেশ একটু চটলো সুধীন। বেশি পড়াশুনো না করে! এম বি ডিগ্রিটা কি পিঠে বয়ে বেড়াতে হবে নাকি শেষকালে? পরক্ষণে ভাবলে, দোষ কি করেছে আর ভগীরথ। ব্যবহার দেখে ও যখন কুলিমজুর ভাবতে পেরেছিল লোকটাকে, তখন বাসস্থান জেনে সুধীনকেই বা অশিক্ষিত চাষা ভাববে না কেন ও।

মুখে রাগটা প্রকাশ করলো না, শুধু বললে, আপনার ট্রাম এসে গেছে।

আর এই ভগীরথ সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে দুপুরে হাসাহাসি করলো রাণু আর সুধীন।

রাণু বললে, বৌটার সঙ্গে কিন্তু আমার আলাপ হয়ে গেছে।

—কখন?

রাণু হেসে বললে, হয়েছে। সত্যি বাপু, বৌটার জন্য ভারী দুঃখ হয়।

সুধীন বিষণ্ণ ভাবে বললে, তা তো হবেই। যা রাক্ষসের হাতে পড়েছে!

রাণু কপট গাম্ভীর্যের স্বরে বললে, তোমাকে আর অত মায়া দেখাতে হবে না।

—কেন ভয় হচ্ছে নাকি?

রাণু বললে, তোমাকে নয়, ঐ হতচ্ছাড়া লোকটাকে। বৌটার জন্যে তোমার দুঃখ হয় শুনলে হয়তো আবার ঠ্যাঙাবে বৌটাকে।

সুধীন রাণুকে কাছে টেনে এনে বললে, ওর মত আমারও কিন্তু

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমাকে মারধোর করতে।

রাণু হেসে বললে, আমার কিন্তু বৌটার মত মোটেই মারধোর খেতে ইচ্ছে হয় না।

সুধীন বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সে কি? বৌটার মারধোর খেতে ইচ্ছে হয় নকি?

রাণু হাসতে হাসতে বললে, কথা শুনে তো তাই মনে হ'ল। এতটুকু রাগ নেই বাপু বৌটির শরীরে।

বারান্দায় শুয়ে শুয়ে রাণুর কথা শুনছিল সুধীন, চোখ ছিল সামনের আকাশে।

কুয়াশার মত আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। শীতের নীচু ধোঁয়ায় ভরে গেছে সারা শহরটা। সরু গলিটার মোড়ে জলছে গ্যাসবাতি। আর ওপরে লম্বাটে আকাশ, এখানে ওখানে দু'চারটে ক্ষুদে তারা। অনেকক্ষণ সেই ছোট আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সুধীন। অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'ল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন অনেক দূরে চলে গেল সুধীনের। অনেক, অনেক দূরে। যেন চারিপাশের কোনকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। চোখ নেই, কান নেই, সমগ্র ইন্দ্রিয় যেন বিকল। মাথায় চিন্তা নেই কোন। অদ্ভুতএকটা —আনন্দ নয়—সুখদুঃখের অতীত অননুভূতপূর্ব এক আবেগ। উদ্দেশ্য-বিহীন।

—দাদা!

নীলার ডাকে তন্ময়তা ভাঙলো সুধীনের। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কিন্তু ক্ষণপরেই অত্যন্ত উৎফুল্ল বোধ করলো সুধীন। অনুভব করলো যেন ওর সমগ্র শরীর থেকে সব বিষাক্ত রক্ত ঝরে গেছে। উন্মাদ রুধিরের বিষ থেকে মুক্তি পেয়েছে। সম্পূর্ণ

সুস্থ হয়ে উঠেছে যেন।

সাড়া না পেয়ে নীলা আবার ডাকলো, দাদা।

—কি রে ?

—বৌদি বলছিলো···

পিছন থেকে স্নেহাতুর কণ্ঠে ভর্ৎসনা এলো, এই ঠাকুরঝি, আবার আমার নামে ? নিজে বলছো, বলো না।

সুধীন সাহাস্যে বললো, হুঁ, একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে বুঝতে পারছি। মানে, নীলা যা বলবে তা দু'জনেই বলতে চাও। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

নীলা বললে, বয়ে গেছে আমার বলতে, বৌদি বললো তাই। আমি তো আর পাড়াগাঁয়ে বাস করি না, দুবেলা ইস্কুলে যাচ্ছি আসছি। কলকাতা দেখিনি নাকি আমি।

রাণু নীলাকে চটিয়ে দেবার জন্যে মৃদু হেসে বললে, ভারী তো শহুরে মেয়ে, নাচতে জানে না গাইতে জানে না সেও যদি শহুরে তো বাড়ীর ঝিটাও শহুরে—

সুধীন ওদের ঝগড়ায় বাধা দিলো।—মারামারি পরে করবি, কি ব্যাপারটা বল্‌তো নীলা ? চিড়িয়াখানা দেখতে যাবি এই রাত্রে ?

নীলা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, বা রে, কোলকাতা দেখেনি বৌদি ভাল করে, তাই বলছে বেড়াতে যাবে।

সুধীন হেসে বললে, কোলকাতা দেখা মানে তো চিড়িয়াখানা, যাদুঘর এই সব দেখতে যাওয়া।

নীলা বললে, রাত্রে কি ঐসব জায়গা দেখা যায় নাকি ? কার্ণিভাল এসেছে গড়ের মাঠে, বৌদি কখনও দেখেনি তাই—

সুধীন হেসে প্রশ্ন করলো, হুঁ, আর তুমি ক'বার দেখেছো শুনি।

—আমিও তো দেখিনি, তাই—

—বেশ, চল্। বাবাকে বলে আয়, আর চট্ করে জামাকাপড় পরে নে, বেশি দেরী করিস না কিন্তু। নটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে।

তারপর রাণুর উদ্দেশে বললে, আমার ধুতি বের করে রেখো একখানা। এটা ময়লা হয়ে গেছে, এ প'রে আর কোলকাতা শহরে—

রাণু হেসে বললে, জামাটাও।

সুধীনের পোষাক বদলাতে দু'মিনিট লাগে, আর রাণুর লাগে দু'ঘণ্টা। এই কথাই সুধীন বলে এসেছে। আজ তাই মিনিট পনেরোর মধ্যে ওরা এসে হাজির হওয়ায় সুধীর একটু বিদ্রূপ না করে পারলো না।

বললে, সে কি, এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তোমাদের ? আমি তো ভাবছিলুম একটা ঘুম দিয়ে নোব।

—কেন, দেরী হয়েছে আমাদের ?

তর্কের সম্ভাবনা দেখে নীলা অতিষ্ঠ হয়ে বললে, বেশ, এখানেই আটটা বাজিয়ে দিয়ে বলবে নটার মধ্যে ফিরতে হবে।

নীলার কথায় হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তর্‌তর্ নীচে নেমে এলো ওরা। আর কথা বাড়ালো না।

গলিরাস্তাটা যেখানে এসে মোড় ঘুরে একেবারে ট্রাম লাইনের গায়ে পড়েছে সেখানে পৌঁছে হঠাৎ গ্যাসবাতিটার একটু দূরে আবছা অন্ধকারে ভগীরথকে দেখতে পেল রাণু। কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সুধীনকে ইঙ্গিতে দেখালো। সুধীনও ফিরে তাকালো। না, ওদের দিকে লক্ষ্য নেই ভগীরথের। একখানা নতুন মডেলের ট্যাক্সির পাশে একজন নোংরা পোষাকের সন্দেহজনক চেহারার লোকের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসেব হচ্ছে। হাতে খানকয়েক নোট ভগীরথের, আরও কিছু আদায় করার জন্যে পেড়াপিড়ি করছে।

আলোয় অন্ধকারকে চেনা সহজ হয়। ঘুমন্ত গ্যাসের আলো থেকে

বড় সড়কের ঝকঝকে আলোয় এসে পড়লো ওরা। দেখলে, শহুরে পৃথিবীর বুকে অন্ধকার কত ঘন হয়ে উঠেছে। অসংখ্য বিদ্যুৎ আলোকের দীপালী রাত্রি যেন। একঘেঁয়ে ক্লিষ্ট কোলকাতার রূপ গেছে বদলে।

মাঝে মাঝে ঠুং ঠাং আওয়াজ। তারপর হাঁপিয়ে পড়া, হাঁপানির রুগীর মত টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয়ার মত একটা বাতাসি শব্দ তুলে ট্রাম এসে থামলো গন্তব্যে। আরো খানিকটা ঘেসো পথ ডিঙিয়ে কার্ণিভালের চত্বরায় পৌঁছলো ওরা। আলোর আতিশয্য আর শব্দের সম্ভ্রম উচ্ছল করে তুললো নীলাকে, আনন্দের ছোঁয়া লেগে রাণুও খুশী হয়ে উঠলো। শুধু হাসি আর হল্লা, আবেগ আর উন্মাদনা। এ যেন সেই সুদূর রূপকথার দেশের রাজকন্যের বাসরসজ্জা। আহ্লাদ-উল্লসিত ঐতিহাসিক যুগেরই কোন শহর হয়তো।

কার্ণিভাল।

করোগেটেড টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে সারা মাঠ। মহাসমুদ্রের মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপ। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পৃথিবী। আর অগণিত জনতার ভিড়। ট্রাউজারের পকেটে হাত গুঁজে চলেছে ফিরিঙ্গি পুরুষের দল। আর তাদের কাঁধে কনুইয়ে ভর দিয়ে চলেছে সুস্থ-যৌবনা য়্যাংলো মেয়ের সারি। চটুল চাহনীতে হাল্কা হাসির আমেজ। অনেক অনেক চোখ ঝলসানো গাঢ় রঙের স্কার্টের মগ্‌জি চমক দেয়। গাঢ় নীলের স্রোত, পলাশের মত লাল রুধিরের স্রোত, কচি কদলী-পত্রের সবুজাভা। আর সজীব যৌবনের উত্তাপ।

স্থূলদেহ একজোড়া মাড়োয়ারী দম্পতি সুধীনদের পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর, আরেক দল। উজ্জ্বলরঙের সাড়ী আর উজ্জ্বলতর গহনা—একটি বাঙালী পরিবার। রক্তিম অধরে অঙ্গরাগের আভাস।

উন্মুক্ত সুগোল বাহুর আকর্ষণ, রেশমী সাড়ীর খসখসানি। লোলুপ বাহুমূলে জরির কাজ করা ব্লাউজের হাতার আঁটুনি।

সুন্দরের রাজত্ব যেন। নিজেকে অত্যন্ত সহজ বোধ করে সুধীন। অদ্ভুত একটা আনন্দের রেশ বয়ে যায় ওর মনে। হঠাৎ মনে হয়, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। সেই পুরোণো দিনের উন্মাদ রক্তের বিষটা যেন লুপ্ত হয়েছে দেহের শিরা উপশিরা থেকে। ভাল হয়ে উঠেছে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্তির রোমাঞ্চ বোধ করে সুধীন।

কার্ণিভালের কেন্দ্রে বিরাট একটা নাগরদোলা ঘুরছে অবিরত। হাজার ফুট উঁচু থেকে যেন ডাইভ দেবে কে, ঐ জলের চৌবাচ্চাটায়। সার্কাস স্কোয়ার জনতার জঞ্জালে ভরে গেছে ইতিমধ্যে। কাছেই একটা কফিঘর।

ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় এসে চমকে দাঁড়াতে হ'ল সুধীনকে।

—কাম হিয়ার, কাম হিয়ার জেনতেলমেন। ত্রাই ইওর লাক্ জেনতেলমেন।

সম্ভবতঃ ফরাসি জাতের মেয়ে। দীর্ঘ ঋজু চেহারা, কোঁকড়ানে সোনালী রঙের চুল, সাদা ধবধবে পোষাক। শুধু কপালে একটা জরির কাজ করা লাল রেশমের ফেটি বাঁধা।

হাত দশেক দূরে একটা গোল বৃত্তের মত বোর্ড ঝুলছে, আর তারই চারিপাশে নম্বর দেয়া রয়েছে। পায়রার পালক লাগানো একটা পিন ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। যথাস্থানে লক্ষ্যভেদ করতে পারলে নাকি পুরস্কার মিলবে।

নীলা প্রশ্ন করলে, কি দাদা?

—ডার্ট। ডার্ট খেলা বলে।

নীলা ফিসফিস করে রাণুকে বললে, আমি খেলবো বৌদি।

—না।

—মোটে তো চার আনা লাগবে, বৌদি ? নাকি সুরে নীলা আব্দার ধরে।

রাণু গম্ভীর গলায় বললে, না।

সুধীন বললে, চলো না তিনজনেই খেলি।

রাণুর সেই এক উত্তর, না না।

সুধীন হেসে বললে, আহা, তাস তো নয়, ভয় কিসের ?

—না হোক্। বলে সেখান থেকে সরে এলো রাণু। বাধ্য হয়ে ওদেরও সরে আসতে হ'ল।

খানিকটা এসেই নীলা বললে, কেন বৌদি, খেলতে দিলে না কেন ?

—কি দরকার।

আরো খানিকটা চুপচাপ এসে নীলা প্রশ্ন করলো, দাদা 'তাস তো নয়' বললো কেন বৌদি ?

—এমনি।

একটা চায়ের ষ্টলে এসে বসলো ওরা। চায়ের জন্যে বয়কে বলে দিয়েই সুধীন বললে, বসো তোমরা, আমি আসছি এক্ষুনি।

বাইরে বেরিয়ে এলো সুধীন পরমুহূর্তেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস সেই কুশ্রী গ্রহের কুটীল দৃষ্টিটা ওর জীবন থেকে সরে গেছে। তবু প্রমাণ দেখতে চায় ও। অনেক আগেই জায়গাটা লক্ষ্য করে রেখেছিল সুধীন। ছুটতে ছুটতে এলো সেখানে।

কি একটা অদ্ভুত ধরনের তাসের খেলা। এক টাকার একখানা টিকিট কেটে নিলো সুধীন। খেলাটা ভাল করে বোঝবার চেষ্টাও করলো না। একখানা তাস পড়লো ওর সামনে। কে যেন বললে তাসখানা তুলতে। তার নির্দ্দেশ মতই তাসখানা তুলে দেখালো ও।

তারপর গোটা কয়েক টাকা গুঁজে দিলো কে ওর হাতে। ও শুধু শুনলো, ও জিতেছে। ব্যস্, আর দাঁড়ালো না। ছুটতে ছুটতে চলে এলো সেখান থেকে। সমস্ত শরীরের ভেতর একটা ঝড় বয়ে গেল যেন। ব্যর্থতার বাষ্প কণ্ঠ চেপে ঠেলে উঠলো।

না।

সেই বিষাক্ত রক্তের বিন্দু এখনো তার শিরার ভেতর ঘুমিয়ে রয়েছে। পরিত্রাণ নাই।

ফিরে এসে বসলো না। বললে, চলো ফেরা যাক্।

—চলো।

সারা রাস্তাটা কোনদিকে কান গেল না, চোখ গেল না কোনদিকে। শুধু একটাই চিন্তা। ভয়। ব্যর্থতা।

বাড়ী পোঁছে তরতর করে ওপরে উঠে এলো, রাণু পিছনে পিছনে। নীলা চিঠির বাক্স দেখে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, বৌদি, তোমার চিঠি।

"রাণুমামীমা,

কবে আসছেন শুনি?

—ইন্দিরা"

পার্কের আধখানা জুড়ে প্যাণ্ডাল। হোগলার ছাউনী হলেও সাজ সরঞ্জামের অভাব নেই কোনদিকে। চারপাশ লাল সালুতে মোড়া। উত্তর দিকটা ষ্টেজের মত করে বাঁধা হয়েছে। ওপরে চাঁপা রঙের রেশমী সামিয়ানা। শেষ বিকেলের দু'একটা লুকোনো রশ্মি কোন ফাঁক থেকে এসে পড়েছে, চাঁদোয়ার সলমা চুমকির কোন কোনটা চমক দিচ্ছে ইতিমধ্যেই।

উত্তর কোণের উঁচু বেদীটায় অচেনা কোন দেবীমূর্ত্তি। আর তার দু'পাশে দুটো ঘর। গ্রীণরুমের মত। একখানা—সিদ্ধিমাতার শয্যা-ঘর না সজ্জাঘর। এপাশেরটায় একখানা চৌকি পড়ে আছে। সামনের চত্বরটা যাত্রার আসরের মত। একখানা বেশ বড়োসড়ো উঁচু টেবিল আর তার ওপর একটা মাইক্রোফোন বসাবার চেষ্টা করছে মিস্ত্রীরা। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও হয়েছে।

সদলে ইন্দিরা যখন এসে পৌঁছলো সিদ্ধিমাতা তখনও দর্শন দেন নি। কিন্তু ভিড় জমেছে প্রচুর। গোয়ালা, গাড়োয়ান, কুলিমজুর। তবে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে রংবেরঙের সাড়ী পরা প্রসাধিত রূপের ঝিলিক, আর রূপপিয়াসী যুবকদের বক্রদৃষ্টি।

এপাশে ওপাশে তাকায় ওরা, তরুণ আর তরুণীর দল। অথচ চোখে মুখে উদ্‌গ্রীব ঔৎসুক্য। সিদ্ধিমাতা কে? কেন এসেছেন? কি উদ্দেশ্য?

হ্যাঁ, আজকেই প্রথম দর্শন দেবেন তিনি। কিন্তু অনেক খবরই

রটে গেছে ইতিমধ্যে।

উত্তর ভারতের কোন এক করদরাজের রূপসী কন্যা ছিলেন ইনি! এঁর কাছে প্রেম ভিক্ষা করে ফিরে গেছে কত না রূপবান যুবরাজের দল। কিন্তু সিদ্ধিমাতা জানতেন গৃহীর জীবন তাঁর জন্যে নয়।

সেই পুরাতন যুগের অবোধ্য বিস্ময় কপিলাবস্তুরাজ শুদ্ধোধনপুত্র সিদ্ধার্থের মতই নাকি সিদ্ধিমাতার আবির্ভাব। রূপবতী রাজকন্যা ঐশ্বর্য্য আর দেহপ্রেম, ভোগ আর বিলাসের ডাক তুচ্ছ করে আধুনিক শিক্ষার সোপানে পা বাড়ান প্রথম যৌবনে। হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন সিদ্ধিমাতা। ইংরেজী, দর্শন আর সংস্কৃতসাহিত্যে তিন তিন বার এম, এ পাশ করেছেন। শুধু কি পাশ করেছেন? প্রতিবারই তাঁর নাম উঠেছে সর্ব্বশীর্ষে। শিখেছেন অজস্র ভাষা, ভারত আর ভারতের বাইরের কত না ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, যে কোন বাঙালীর চেয়ে ভাল বাংলা বলতে পারেন; অনর্গল। তাঁরই হঠাৎ একদিন জাগলো ঈশ্বরবোধ, এলো জ্ঞানের ডাক। কষায়বাসমাত্র সম্বল করে কৈলাসের পথে যাত্রা করলেন রাজকুমারী দময়ন্তী। দময়ন্তী, না স্বর্ণলছমী? ঠিক্ জানে না কেউ। দীর্ঘদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সমাজ আর মানুষের পরিত্রাণের বাণী নিয়ে ফিরে এসেছেন সিদ্ধিমাতা, শুধু এইটুকুই জানে।

অদ্ভুত!

আশ্চর্য্য।

তাই অশিক্ষিত মানুষের ভিড় আজ। বিস্ময়ের চোখ চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তারা। কলির কলঙ্ক মুছে নিতে এসেছেন যিনি তাঁর দর্শনের আকাঙ্খা তাদের মনে। আর শিক্ষিত সভ্য মানুষের ভিড়ও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। অনুসন্ধানী উৎসুক চোখে তাদের

কিছুটা কৌতুকের রেশ।

এপাশে মেয়েদের ভিড়। তারই মাঝে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে এগিয়ে গেল ইন্দিরা। সমিতা আর বাণীও। একটি বয়স্কা বধূও এসে দাঁড়ালো ওদের পাশে।

হঠাৎ অনুদ্দেশ প্রশ্ন সমিতার।—কখন আসবেন?

ওদিক থেকে কে যেন উত্তর দিলো, পাউডার টাউডার মাখা শেষ হলেই।

কেউ হাসলো। কেউ বা চটলো।

বয়স্কা বধূটি প্রশ্ন করলো, বাংলায় কথা বলবে তো?

উত্তর এলো।—না, হিন্দীতে।

—ইংরিজীতেও হতে পারে। আরেকজন বললে।

—মন্ত্রটন্ত্র দেয়? দীক্ষা নিতাম তাহ'লে। সহাস্য প্রশ্ন কার।

—না। শিষ্যটিষ্য হতে হ'লে টাকাখরচ করতে হয়।

—অনেক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি শিষ্য হয়েছে।

—অমন সুন্দর চেহারায় কি শিষ্যের অভাব হয়!

—বয়স তো অনেক।

—দেখে মনে হয় খুব কম বয়েস।

—হিমালয়ে ছিল, আঙুর আপেল খেয়েছে—

এমনি ভাবেই ক্রমশঃ মোড় ফিরছিল কথাগুলোর, হঠাৎ ফিসফিস শোনা গেল, আসছেন, আসছেন।

নড়ে চড়ে উঠলো সকলে। কথাবার্ত্তা চমকে চুপ করলো। চুড়ি আর কঙ্কন টুনটুন করে উঠলো। শাড়ীর খসখসানি।

মাইকের সামনে এসে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘোষণা জানালেন। মা আসছেন। সত্যিকারের মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করবেন মা,

জাতিপ্রথার ব্যর্থতা আর অভিশাপ দূর করবার জন্যে আবেদন জানাবেন।

আবার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। নিস্তব্ধ আগ্রহ। তারপর আবার সুরু হ'ল গুলতান। এ কেমন ধর্ম্মান্বেষী? জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখায় সমাজসচেতন রাজনৈতিক নেতারা। কৈলাস আশ্রমের সিদ্ধযোগিণীর কাজ তো ধর্ম্মকে দৃঢ় করা, বর্ত্তমান সামাজিক বিচারব্যবস্থাকে নতুন জীবন দেয়া।

প্রথমটা কেউই বিশ্বাস করতে পারে নি। এই কি সিদ্ধিমাতা? হাঁ, ইনিই। হাসিহাসি মুখে সাজঘরের পর্দ্দা সরিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন মাঝখানের টেবিলটার কাছে। জনতার দিকে এক চোখ সস্মিত দৃষ্টি ফেলে নমস্কার জানালেন সিদ্ধিমাতা, তারপর লাফিয়ে উঁচু টেবিলটার ওপর উঠে পদ্মাসন হয়ে বসলেন। অবিশ্বাস্য রকমের একটা চপল চাঞ্চল্য চোখেমুখে, বাক্যে ব্যবহারে। কি একটা রসিকতাও যেন করলেন পার্শ্ববর্তীনী ভদ্রমহিলার সঙ্গে।

ইন্দিরার কানে কোন কথা ঢুকছিল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল ও।

প্রথম যৌবনা তরুণীর মত সুন্দর সুডোল দেহ। নিখোঁপা কালো কেশের মেঘ জমে আছে পিঠের ওপর। নীল, গাঢ় নীল চোখে চিকন তারার ঔজ্জ্বল্য। সারা দেহে গোলাপী বর্ণাভা। মসৃণ। শুধুমাত্র একটুকরো বাঘছাল কোনরকমে কোমর আর বুকের উদ্দামতা ঢেকেছে। কর্কশ ব্যাঘ্রচর্ম্মের ছিন্ন অংশে জেগে উঠছে যৌবনের তরঙ্গরেখা।

হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙলো ইন্দিরার। পাশের বয়স্কা বধূটি কি যেন বললে।

ইন্দিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে তাকালো।—বললেন কিছু?

—বলছিলাম, রাজকন্তে না হাতি। ঠিক্ চিনেছি, আমাদের কালা মুনসেফের মেয়ে।

—সেকি? বাঙালী?

—বাঙালী নয় তো কি! প্রেম করে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়েছিল, আজ সিদ্ধিমাতা হয়ে এসেছেন।

ইন্দিরা শুনলো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না। সিদ্ধিমাতার দিকে চোখ তুলে তাকালে কিন্তু মনে হবে না ঐ নিষ্কলুষ সৌন্দর্য্যের আড়ালে কোন কলঙ্ক থাকতে পারে, ঐ সরল মুখের কোন লুকোনো ভাঁজে দুষ্টতার অলঙ্কার। না, ও চোখে দুর্ণামের রটনা থৈ পেতে পারে না।

ইন্দিরার চোখে নামলো অনিমেষ দৃষ্টি।

উঁচু বেদীর মত টেবিলটার ওপর পদ্মাসন হয়ে বসেছেন উনি। আর এক ঝাঁক আলোর প্লাবন এসে পড়েছে তাঁর সারা অঙ্গে। যেন আলো নয়, জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে বলে ভুল হতে পারে। গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মাজা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। বুকের স্তনতরঙ্গ কণ্ঠি ছুঁয়েছে। আর সুনয়নে উজ্জ্বল দুটি বুদ্ধিদীপ্ত হীরের স্ফুলিঙ্গ। অন্তর্বাসের আচ্ছাদন নেই, শুধু ব্যাঘ্রচর্ম্মের অবহেলাবরণ। সুডোল উন্মুক্ত বাহু। গুলালের ঈষৎসিঞ্চনে যেমন রাঙা হয়ে ওঠে দেহ, তেমনই এক বর্ণাভা কাঁধে কণ্ঠে, মধুর মুখাবয়ব জুড়ে।

তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ইন্দিরা। এমন অপরূপ রূপের প্রকাশ সে আর কখনো কি দেখেছে? আরো অনেকের মত হয়তো ভক্তি আর শ্রদ্ধার অশ্রু ওরও অপাঙ্গে টলমল। ইন্দিরা ভাবলো, এ সত্যসৌন্দর্য্যের অন্তরালে কোন গ্লানি থাকতে পারে না। আর কি অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর! গম্ভীর আর স্থিতবিশ্বাস, অথচ কত কোমল মাধুর্য্য।

শুধু ইন্দিরাই নয়। কোন এক জাদুবলে কখন নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল

সমগ্র জনতা। দর্শনাকাঙ্খীর দলে নিঃশব্দ বিস্ময়।

বাণী সুরু হ'ল। বাণী শেষ হ'ল।

কিছুক্ষণের জন্যে একটা স্তম্ভিত বিমোহ। শান্ত, নির্ব্বাক। তারপরই ধীরে ধারে কেমন একটা কলগুঞ্জন সুরু হ'ল। তন্ময়তা ভাঙলো ইন্দিরার, চোখের কুয়াশা হ'ল স্পষ্ট। আর পরক্ষণেই অদূরে সুধীনকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলো। সে ডাক পৌঁছলো না সুধীনের কানে।

নেশার ঘোরে, নির্মন একাগ্রতায় সুধীনও হয়তো বাণী শুনছিলো।

ওপাশে তেরপলে ঘেরা ছোট্ট একখানি ঘর। সিদ্ধিমাতার আলোচনা কক্ষ। আরো বিস্তৃত আলোচনায় যারা উৎসুক তাদের আহ্বান জানিয়ে সিদ্ধিমাতা সেখানে গিয়ে বসলেন।

সুধীনও এগিয়ে গেল সেদিকে।

সুধীনকে দেখা দেবার জন্যে ইন্দিরাও ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। সমিতা আর বাণীর বাধানিষেধ শুনলো না।

পার্শ্বচরীদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন সিদ্ধিমাতা। হাসি খুশি মুখ, চটুল চাহনি। কৌতুকলাস্যের কাঁপন তাঁর কথার ভাঁজে ভাঁজে। অনেক অনেক হাসি ছিটিয়ে চোখ তুললেন সিদ্ধিমাতা, আর সরু নদীর মত হঠাৎ মাঝপথে থমকে থেমে গেল কথা। কথা আর হাসি। সুধীনের মুখের ওপর স্থির রইলো তাঁর দৃষ্টি, কয়েকটি ছোট মুহূর্ত্তের জন্যে। বিস্ময় জাগলো তাঁর বোবাচোখে।

—তুমি!

না। কোন অস্ফুট কথাও বের হ'ল না সিদ্ধিমাতার মুখ থেকে।

—তুমি!

শুধু ছোট্ট এই টুকরো কথাটাই যেন তাঁর চোখের ভাষা বলে

উঠলো। আশ্চর্য্য বিস্ময়ের ভাষায়। ইন্দিরার তাই মনে হ'ল।

সুধীনের দিকে একচোখ তাকিয়ে আরো ভালো করে লক্ষ্য করলো। হ্যাঁ, যেন বড়ো দুর্ব্বল দেখালো তাকে। নিস্তেজ আর অসহায়। আহত হরিণীর মত অবোধ্য এক যন্ত্রণা!

তারপর। তারপর খুব ঠাণ্ডা আর প্রাণহীন একটা স্বর শোনা গেল। একটি মাত্র কথা।—ব'সো।

সুধীনের তখন ছাত্রজীবন। ওরা জনকয়েক বন্ধু মিলে থাকতো একটা হষ্টেলে। সকলেই সতীর্থ। সবার চোখেই রং-চং, মনে চাঞ্চল্য। যৌবনের প্রথম ধাপ সেটা।

রাস্তার ওপরেই ওদের হষ্টেল। অবসরে অবকাশে বারান্দায় এসে বসতো ওরা। হৈ হৈ করতো, আড্ডা দিতো, তাস পেটাতো। কিন্তু সুধীন ছিল একটু পৃথক, একটু অন্য ধরনধারণ ওর। চুপচাপ থাকতে ভালবাসতো ও। নির্জ্জনে। বন্ধু বলতে, কুঠিসঙ্গী ধনঞ্জয়। যা কিছু আলাপ আলোচনা, কথা আর কল্পনা, সব কিছুই ঐ একটি মানুষের কাছে। তাই, বারান্দার কেদারা দখল করে যখন আর কেউ থাকতো না, তখন দেখা যেত ওদের দুজনকে। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বসে থাকতো ওরা।

আর ঠিক বেলা ন'টা চল্লিশ মিনিটের সময় দেখা যেত মেয়েটিকে। খুব সাদাসিধে একটি শাড়ী তার অঙ্গে, মুখেচোখে শান্ত আর ঠাণ্ডা একটা ভাব। বুকে একরাশ বই চেপে খুটখুট করে হেঁটে যেত মেয়েটি। প্রথম প্রথম হেঁটেই যেত আর আর মেয়েদের মত, আড় চোখে দেখতো না, চুল ঠিক আছে কিনা, কাঁটা খসে পড়ছে কিনা। ধীর ছন্দে চলার তালে তালেই এগিয়ে চলতো চোখের দৃষ্টি।

সে-দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি তখনও সুধীনের। তবু ও স্বপ্ন বুনতো, বোলাতো কল্পনার রং। ঐ সময়টুকুর জন্যে উন্মুখ আগ্রহে সুধীন আর ধনঞ্জয় এসে বসতো বারান্দায়। অপেক্ষা করতো। অনেক

দূর থেকেই দেখে চিনতে পারতো ওরা। কাছে, ক্রমে ক্রমে খুব কাছে এসে পৌঁছতো মেয়েটি। ওদের দুজনের মনেই খুশীর খঞ্জনী বেজে উঠতো। তারপর ধীরে ধীরে মেয়েটি আবার অদৃশ্য হয়ে যেত দূরের গলিতে।

এমনি ভাবেই কাটছিল দিনের পর দিন। মাস হয়তো বা।

হঠাৎ একদিন কেন জানি চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। চোখোচোখি হলো সুধীনের সঙ্গে। পরক্ষণেই আহত লজ্জার রং ফুটলো মেয়েটির মুখেচোখে। চোখ নামিয়ে নিলো।

এরপর দুটো দিন হয়তো চেষ্টা করেই মেয়েটি মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটলো। ওর ঠিক মাথার ওপর দু'জোড়া প্রশংসা-ভরা চোখ যে তাকিয়ে আছে তা যেন জানেই না। কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। আবার চোখে চোখ পড়লো। দৃষ্টি নামিয়ে নিল ও।

ক্রমে এমন একদিন এলো যখন সুধীন টের পেল মেয়েটির জীবন জাগতে শিখেছে। অনেক দূর থেকেই সুধীন দেখতে পেত, মেয়েটি যত এগিয়ে আসে ততই বারবার তাকায় ওর দিকে। আর, আর প্রতিদিন গলির মোড়ে অদৃশ্য হবার আগে চট্ করে একবার ফিরে তাকায় মেয়েটি।

সুধীন আর ধনঞ্জয়ের মধ্যে কোন আলোচনা হচ্ছে বুঝতে পারলেই লজ্জার হাসি হাসতো মেয়েটি ঠোঁট টিপে টিপে।

সুধীনের মনে একটা নেশার সুর স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ অধৈর্য্য হয়ে উঠলো সুধীন।

এমন সময় উপায় করে দিলো ধনঞ্জয়ই। ওর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া থাকতেন কাছাকাছি। আর ধনঞ্জয় মাঝে মাঝে যেত সেখানে।

—কি করে আলাপ করা যায় বলতো! সুধীন প্রায়ই প্রশ্ন করতো।

তাই হঠাৎ একদিন ধনঞ্জয় বললে, উপায় আছে।

সুধীন একটু বিস্মিত হ'ল।—মানে ?

—তোমার মানসীকে দেখলাম, আত্মীয়ের বাড়ীতে। তাঁর মেয়ের সহপাঠী ও।

—সে কি ?

সুধীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু…

—কিন্তুটিন্তু না। একদিন চল্ আমার সঙ্গে, পমির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে ওর কাছে বলে ফেল।

সুধীন বললে, পমি কে ?

—দূর সম্পর্কে এক আত্মীয়ের মেয়ে, দাদা বলে আমাকে, খুব ভক্তি করে।

হেসে বললে ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় হাসলো, কিন্তু ভুললো না। সত্যিই একদিন সুধীনকে নিয়ে গেল। আর ক্রমে ক্রমে পমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ফলে একদিন সুধীন বলেই ফেললো ওর আর্জিটা।

শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লো পমি।—এতো ছেলেমানুষ আপনারা। আরার হেসে ওঠে পমি।

সুধীন বললে, হাসি নয়, সত্যি আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

—কেন, নিজে ডেকে কথা বলতে পারেন না ?

হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পালা শেষ হল। পমি শেষ অবধি সম্মতি জানালো।

সুধীন জিজ্ঞেস করলো, কবে ?

পমি হেসে বললে, কি করে বলবো। আপনার ইচ্ছেয় তো আর হবে না। ওকে বলে দেখি, কবে কখন সুবিধে হবে ওর।

পমির কথামত দুদিন পরে এসে খোঁজ নেবার কথা ছিল সুধীনের। কিন্তু তার আগেই খবর এসে পৌঁছলো। ধনঞ্জয়ের মারফৎ। মেয়েটি নাকি তার আপত্তি জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, এমন কয়েকটা কথা বলেছে যা যথেষ্ট অপমানকর। শুনলো সুধীন। আর ওর বুকে মোচড় দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস!

ধনঞ্জয়ের চোখে হয়তো বা ধরা পড়েছিল, রক্তহীন পাংশু মুখের চেহারা। সত্যি, বড় আঘাত পেয়েছিল সুধীন। ও নিজেও বুঝতে পারে নি সে অনুভূতির ভিৎ কোথায়। অপমানের আঘাত? না, লজ্জা? হ্যাঁ, ধনঞ্জয় আর পমির কাছে মুখ দেখাতেও কেমন যেন লজ্জা হয়েছিল। একজনের কাছে ওর কোন মূল্য নেই, এইটুকুই যেন সারা বিশ্বের চোখে সুধীনকে অপ্রয়োজনের ঘরে ঠেলে দিলো।

মেয়েটির উদ্দেশে অনেক অভদ্র উক্তি করেছিল ধনঞ্জয়। সুধীনের ব্যর্থতা যেন ওর বুকেও ছোঁয়া দিয়েছিল। দীর্ঘশ্বাসের সুর দুলেছিল ওর মনেও। কিন্তু সুধীন শুধু অপ্রতিভ হাসি হেসেছিল। ব্যর্থতার ব্যথা চাপা দেবার জন্যে। সায় দিতে পারে নি ধনঞ্জয়ের ব্যঙ্গোক্তিতে। মনে হয়েছিল মেয়েটিকে ছোট করে ধনঞ্জয় যেন ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

এরপর পমির কাছ থেকে দূরে থাকতে সুরু করলো সুধীন। ধনঞ্জয়ের দৃষ্টিটা ও তবু সহ্য করতে পারে, কিন্তু পমির হাসি হাসি মুখটা মনে হ'ত যেন বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায় ভরা। তাই, পমির বারংবার অনুরোধ উপেক্ষিত হয়েছে। ধনঞ্জয় একটা দিনের জন্যেও রাজি করাতে পারে নি সুধীনকে। না, পমির সঙ্গে ও আর সহজ হয়ে কথা বলতেও পারবে না।

তবু, হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। কে জানে। সুধীনের পরে কখনও কখনও সন্দেহ হয়েছে, ওদের সেই সাক্ষাৎটা হয়তো হঠাৎ ঘটে নি। পমির সধৈর্য্য প্রতিক্ষাই হয়তো বা সাক্ষাতের কারণ।

নিজের মনেই পায়ে চোখ রেখে হাঁটছিল সুধীন। হঠাৎ ডাক শুনলো রাস্তার ওপার থেকে।—সুধীনদা!

ফিরে তাকালো সুধীন। দেখলো, খুসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে পমির সারা মুখ। হাত নেড়ে দাঁড়াতে বললে পমি, আর পরমুহূর্ত্তেই ছুটে রাস্তা পার হতে গেল। একরাশ বই ছিল পমির হাতে-বুকে, পায়ে স্লিপার। ছুটে আসতে গিয়ে ট্রাম লাইনের মাঝখানে স্লিপারটা খুলে গেল পমির পা থেকে। জুতোর দিকে চোখ গেল পমির। দেখতে পেল না দুদিক থেকে দুখানা ট্রাম ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আসছে দ্রুতবেগে।

ভয়ে আশঙ্কায় চিৎকার করে উঠেছিল সুধীন।

সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও শিউরে ওঠে ও। অথচ। সত্যি, এমন উপস্থিতবুদ্ধি, এতটা নিরুদ্বেগ ঠাণ্ডা ভাব—বিশেষ করে এমন একটা বিপদের মুখে! মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিল পমি। বইগুলো হাত থেকে ফেলে দিয়ে দুজোড়া ট্রামলাইনের ঠিক মাঝখানটায় আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। মুহূর্ত্ত পরেই দুখানা ট্রাম বেগে বেরিয়ে গেল, এতটুকু আঁচড় লাগলো না ওর শরীরে। ওকে পাশ কাটিয়ে গিয়েও ট্রাম দুখানা থমকে থেমে পড়েছিল কয়েক গজ দূরে, ড্রাইভার দুজনই ফিরে তাকিয়েছিল পমির দিকে, বিস্ফারিত চোখে। তাজ্জব! মনে মনে হয়তো ভেবেছিল, কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি!

পমি কিন্তু তখন খিলখিল করে হাসছে।

সুধীন ছুটে এলো। বইগুলো তুলে ওর হাতে দিলো। তারপর

দুজনে রাস্তা পার হয়ে এসে দাঁড়ালো ফুটপাথে।

—কাজ ফুরিয়েছে বলে আর যান না বুঝি! দোষ কি আমার? রূপ দেখেই ভুলেছিলেন, মন চিনতে পারেন নি, অথচ তার জন্যে শাস্তি দিচ্ছেন আমাকে!

সুধীন হাসবার চেষ্টা করে বললে, তুমি দোষ করেছো একথা তো বলি নি! তাকেও মন্দ বলি না, আমিই হয়তো ভুল করেছিলাম। আমার দিকে দুবার তাকিয়েছে কি একবার হেসেছে—এই দেখে আমিই বা আজেবাজে ভাবলাম কেন!

পমি বললে, ভাবাটা অন্যায় নয় মোটেই। বাঙালী ঘরের মেয়েরা মাটিতে চোখ রেখে হাঁটে, আর জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কাঁদে। তাই কখনও যদি চোখ তুলে তাকায় বা মুখ ফুটে হাসে তো বুঝতে হবে নিশ্চয় পুতুল নিয়ে খেলছে না সে।

সুধীন হেসে বললে, ধনঞ্জয়ের মত বেশ বড়ো বড়ো কথা বলতে শিখে গেছো তো।

পমি লজ্জিত হ'ল।

একটু চুপ করে থেকে বললে, যাই বলুন, ও মেয়েটা আপনার যোগ্য নয়।

সুধীন বিস্ময়ের চোখ ফেললো পমির চোখের ওপর। বললে, উল্টো বললে, যে প্রত্যাখ্যান করে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন তার বেলায় ওঠেই না।

—তার কাছে বা আপনার কাছে না উঠলেও বাইরের পাঁচজন সে বিচার করবে না?

সুধীন হেসে বললে, কোনদিন যদি কোন মেয়ের যোগ্য হতে পারি তখন তোমার রায় শুনবো।

কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলো পমি। বললে, এত ছেলেমানুষি করেন !

—ছেলেমানুষি !

—তা নয়তো কি ? এবার যেন সত্যি চটে উঠলো ও। বললে, নিজেকে এত ছোট ভাবেন কেন ! একজন হীরেকে কাচ মনে করলেই তো আর সত্যিই সে কাচ হয়ে গেল না।

সুধীন হো হো করে হেসে উঠলো। এপাশের ওপাশের লোক ফিরে তাকালো ওদের দিকে। আর লজ্জায় নুয়ে পড়লো পমি।

সুধীনের কিন্তু সেদিকে চোখ নেই। ও হাসতে হাসতে বললে, খুব সিনেমা দেখছো বুঝি আজকাল ?

পমি হাসলো। বললে, আপনার সবতাতেই হাসি।

সুধীন বললে, বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু অন্য কেউ যতক্ষণ না সে হীরেটা চিনতে পেরে বলছে যে এটা হীরে, কাচ নয়, ততক্ষণ অবধি তো তার হীরেত্ব প্রমাণ হচ্ছে না।

পমি বললে, আবার একটা সিনেমার মত কথা বলবো ?

—কি ?

—যে জহুরী সে জাহির করে না। সে নিজের বিশ্বাস নিজের মনেই রাখে। বলে বেড়ায় না।

সুধীন বললে, না, ভাল ট্রেনিং দিয়েছে ধনঞ্জয়। যা বললে, তাতে ভুল থাকলেও শুনতে ভালো। মেনে নিলাম। কিন্তু এবার তো আমি এ পথে, তুমি ?

—এখান থেকে ট্রামে উঠবো। বলে ষ্টপেজের দিকে পা বাড়ালো পমি।

সুধীনও অন্য পথ ধরলো। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে দাঁড়ালো পমি।

চিৎকার করে বললে, কাল দেখা হবে তো আবার ?

সুধীন না ভেবেই ঘাড় নাড়লো।

পমি দূর থেকেই আবার চিৎকার করলো ঠিক চারটের সময়, ঐ মোড়ে।

—কেন ? হঠাৎ যেন কারণ খুঁজে পেল না সুধীন।

—থাকবেন। ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি দুলিয়ে বললে ও। তারপর থামা ট্রামটায় উঠে পড়লো।

কলেজের ছুটির পর ঘণ্টা কয়েক বড়ো নির্জন, বড়ো বেশি একা একা বোধ করতো সুধীন। তাই এ সময়টা পমির সঙ্গ ওর মন্দ লাগতো না। সেই রাস্তার মোড়ে—ট্রাম ষ্টপেজের সামনে এসে অপেক্ষা করতো ও, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পমি এসে হাজির হ'ত। কোন কোনদিন হয়তো ওর একটু দেরী হয়েছে, তাড়াতাড়ি পা চালাতে চালাতে দুর থেকেই দেখতে পেয়েছে পমি চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওর খোঁজে, আর অধৈর্য্য হয়ে পায়চারী করছে। মনে মনে বেশ একটা কৌতুক বোধ করতো সুধীন। মাঝে মাঝে ভাবতো, মেয়েটা কি শেষে আমার প্রেমে পড়লো নাকি ? কিন্তু, পরক্ষণে নিজের মনেই হেসে উঠতো। একেই বলে আত্মপ্রেম, নিজেকে বড়ো করে দেখার লোভ। তা না হ'লে বাচ্চা বয়সের একটা মেয়ের কাছে আঘাত পেয়েও নিজেকে 'হিরো' মনে করে কোন সাহসে। ও কিছু না। সুধীনের সময় কাটানোর দরকার, তাই। তাছাড়া, সুস্থ সুন্দর একটি মেয়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে গেলেও কোন ক্লান্তি আসে না, বরং ভালই লাগে। পমির দিক থেকেও এই একই নেশা হয়তো। সুধীন অন্ততঃ তাই ভাবতো। কৈ, কথায়বার্তায়, আলাপে আলোচনায় কোন ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত তো পায়নি। আন্তরিক, কিন্তু

অন্তরস্পর্শী নয়।

সেদিন তাই একটু চমকে উঠেছিল সুধীন।

দেখা হতেই একমুখ হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল পমি। বললো, আপনি কি বলুন তো?

—কেন? অবাক চোখে হাসলো ও।

পমি বললে, আপনি রাঙাদার কাছে সব গল্প করেন? আমাদের দেখা হয় এখানে, গল্প করি, এসব?

সুধীন হেসে ফেললো।—হ্যাঁ, বলি তো।

—হ্যাঁ, বলি তো! সুধীনের কথারই প্রতিধ্বনি তুললো পমি:

কৌতুকের দৃষ্টিতে পমির মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই থমকে থামলো ও। মনে হ'ল পমির চোখ ঠেলে জল নামতে চাইছে।

চুপ করে গেল সুধীন।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও পমির কাছ থেকে আর কোন কথা না পেয়ে বললে, কি ব্যাপার বলো তো? কি হয়েছে কি?

পমি যেন ভেঙে পড়লো।—কিছু হয় নি, কিচ্ছু হয় নি। আপনি, আপনি কিচ্ছু বোঝেন না।

সুধীনও একটু বিচলিত হয়েছিল, কি যেন বলতেও চেষ্টা করেছিল, তার আগেই সজল চোখ তুলে খিলখিল করে হেসে উঠলো পমি।

বললে, বয়েসই বেড়েছে, আর ঢ্যাঙা হয়েছেন মাথায়। বুদ্ধিসুদ্ধি আপনার একেবারেই নেই।

সুধীন হেসে বললে, বন্ধুবান্ধবরাও তাই বলে।

—ঠিকই বলে। ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিলো পমি, নেহাৎ আমার বুদ্ধিটা একটু বেশি, তা না হ'লে দেখাশোনা ছাড়তে হত আমাদের।

সুধীন হাসলো। ওর কথা শুনে নয়। আনন্দে। আনন্দে হেসে উঠলো ও, সার্থকতার খুশিতে।

আর এরপর থেকেই দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

ইস্কুল পালানোর অসুবিধে ছিল, কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত। কলেজে ঢুকে সে বাধাটুকুও দূর হ'ল। আশা আনন্দ, সুখ আর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন কেটে চললো ওদের। কলেজ পালিয়ে দু'জনেই টো টো করে ঘুরেছে হয়তো সারা দুপুর। কখনো ইডেনগার্ডেনে, কখনো বা রাস্তায় রাস্তায়। কি শীত কি গ্রীষ্ম, দু'জনে পাশাপাশি হাতধরাধরি করে ঘুরে বেড়িয়েছে, হয়তো বসেছে কোন গাছের ছায়ায়। চীনেবাদাম নয়তো চানাচুর চিবোতে চিবোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে। গাছের ছায়া ঠাণ্ডা হয়েছে, তাপ কমেছে বাতাসের। দোকানের শো-কেস দেখতে দেখতে হয়তো হেঁটেছে মাইলের পর মাইল, খিল খিল করে হেসে উঠেছে হয়তো পমি, অকারণে। আর কখনো সখনো ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখেছে দু'জনে পাশাপাশি, হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ ছুইয়ে। সুমধুর স্বপ্নের মত ওদের দিন কেটে গেছে। দিন কেটে গেছে।

তারপর...

সিনেমা সবে শেষ হয়েছে তখন। সিনেমার গল্প সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে বেরিয়ে আসছিল ওরা। হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, ও একে সামলায়।

এমন সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই পমি চাপা গলায় বলে উঠলো, এই, রাঙাদা!

কিন্তু, মুখ লুকোবার আগেই ধরা পড়ে গেছে ওরা।

আর পরের দিন থেকেই সব চুপ চাপ। অনেক অপেক্ষা করেও,

অনেক খোঁজ করেও পমির দেখা পেল না সুধীন। বুঝতে পারলো, কলেজ ছাড়তে হয়েছে পমিকে। আর বাইরে বেরোবার স্বাধীনতাটুকুও বিসর্জন দিতে হয়েছে। অনুশোচনায় মন ভরে গেল সুধীনের। সেদিন বারবার আপত্তি করেছিল পমি। সিনেমায় যেতে চায় নি। শুধু সুধীনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি বলেই রাজি হয়েছিল। পেয়ে হারানোর ব্যথার চেয়েও আরো বেশি করে অনুভব করলো ও পমির অবস্থা। কত কথা বলবার ছিল, কত কথা জানবার। সব যেন মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল।

দুটো মাস কেটে গেল, পমির কাছ থেকে কোন খবর না পেয়ে। সুধীনও হয়তো ফাইনাল পরীক্ষার পড়ায় ডুবে গিয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ইচ্ছে হ'ল পমির সঙ্গে দেখা করবার। একবার, শেষবারের মত। আপত্তি করবে কি ওর বাড়ী থেকে? কে জানে!

অনেক ভেবেচিন্তেও শেষ অবধি সাহসে কুলোলো না ওর।

সন্দেহ জাগলো। হয়তো তা নয়, আগের মতই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পায় হয়তো পমি। হয়তো ভুল করেছিল, হয়তো বা ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই সুধীনের কাছ থেকে সরে গেছে নিজের ইচ্ছেয়। কে জানে!

এমনি নানান কথা ভাবছিল সুধীন। হোষ্টেলের বারান্দায় বসে বসে। সন্ধ্যে ঘন হয়েছে তখন। আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে সুরু করেছে কয়েকটা তারা। গ্যাসবাতির ধোঁয়াটে আলোয় সামনের রাস্তাটা অস্পষ্ট। একটা ফিটন, কয়েকখানা দ্রুতগতি মোটর, রিক্সার ঠুংঠাং …ফেরিওয়ালার কি একটা অবোধ্য ডাক। কোন কিছুই শুনছিল না ও, কোন কিছুই দেখছিল না যেন। শুধু দৃষ্টিহীন ভাসাভাসা চোখে

তাকিয়েছিল।

হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনলে, সুধীনবাবু! সুধীনবাবু আছেন? চমকে ফিরে তাকিয়েই উঠে এলো সুধীন! স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখলো। না, ভদ্রমহিলাকে চেনে না ও।

বললে, হ্যাঁ, আমিই। কি চান?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। তারপর খামে মোড়া একটা চিঠি দিয়ে বললেন, উত্তর চাই এখনই।

চিঠিটা পড়লো সুধীন। বারবার। তবু বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। পমি। পমি লিখেছে চিঠি। তাড়াতাড়িতে লেখা, স্পষ্ট করে মনের কথাও খুলে লিখতে পারেনি যেন। ভাল করে পড়াই যায় না, অজস্র ভুলে ভরা। শুধু এইটুকুই বুঝলো সুধীন যে ভদ্রমহিলাটির সাহায্য পেয়ে তাড়াতাড়িতে চিঠিটা লিখেছে পমি।

—উত্তর লিখে না দিলেও হবে, মুখে বলে দিন। ভদ্রমহিলা বললেন, মৃদু হেসে।

এতক্ষণে ভাল করে চেয়ে দেখলো সুধীন, আবার। বললে, আপনি?

—আমি পমির মাসীমা হই। হাসলেন ভদ্রমহিলা। তারপর বললেন, তবে আমাকে ভয় নেই, সাহায্যই করবো আমি। চিঠির কি উত্তর দেবেন বলুন।

কথা বলতে পারলো না সুধীন। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। আর নিঃশব্দে স্যুটকেশটা গুছিয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলো।

পমি নীচেই দাঁড়িয়েছিল, একটা বাড়ীর আড়ালে।

সুধীন বললে, তবে চিঠি দিয়েছিলে কেন?

ভদ্রমহিলা হেসে উত্তর দিলেন, মন জানবার জন্যে হয়তো!……

যাক্, আর সময় নষ্ট করো না, সোজা এখান থেকে হাওড়া ষ্টেশনে। আমি চল্লাম।

সুধীন বিব্রত বোধ করলো।—একা ফিরবেন ?

উত্তর এলো, হ্যাঁ, তা নইলে আবার তোমাকেই একা ফিরতে হবে কিনা! বলেই পা বাড়ালেন তিনি।

পমি ডাকলো, ফুলমাসীমা, দাঁড়াও একটু। বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো পমি। আর ওর দেখাদেখি সুধীনও প্রণাম করলো।

—চিঠি দিস মাঝে মাঝে। ঠিকানাটা রেখিছিস তো ? ভদ্রমহিলা পমিকে বললেন।

পমি ঘাড় নাড়লো, চোখ তুলতে পারলো না। ওর চোখের জল লুকোবে কি করে ফুলমাসীমার কাছ থেকে।

ট্রেণ ছেড়ে দেবার পর একটু স্বস্তি বোধ করলো দু'জনে। কোথায় চলেছে, কেন চলেছে—এসব কিছুই যেন জানে না। জানতে চায় না। শুধু দূরে, এখান থেকে অনেক দূরে, সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে আসা।

সুধীন হঠাৎ বললে, আমি যদি বেঁকে বসতাম তা হ'লে কাল এতক্ষণ পি ড়িতে বসেছো, কি বলো ?

পমি হাসলো। বললে, হয়তো তাই। কিংবা হয়তো কড়িকাঠ থেকে ঝুলছি এতক্ষণ।

পমির হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে সুধীন বললে, বোকা মেয়ে!

স্বপ্নালু চোখ মেলে তাকালো পমি, তারপর খুশির হাসি দুলে উঠলো ওর ঠোঁটে।

নিশ্চুপ, নির্ব্বাক্ চোখ মেলে বাইরের আকাশের দিকে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে রাত্রির মেল ট্রেণ। দু'পাশের গাছগাছালি ঝড়ের মত পিছনে ছুটছে—অন্ধকারেও বোঝা যায়। কিন্তু। ওদের মন যেন আরো ছুটতে চায়, আরো দ্রুত। সমস্ত পৃথিবীর পথ শেষ করে উধাও হতে চায়।

অনেকক্ষণ পরে একটা ষ্টেশন এলো। রাত্রির আহার সেরে নিয়ে শুয়ে পড়লো দু'জনে।

তারপর, তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল সুধীন।

বেশ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছবে ওরা। কিন্তু, কিন্তু পমি কোথায় ?

ল্যাভাটরির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সুধীন। একটু পরেই একটি হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। আর ধক্ করে উঠলো সুধীনের বুকের ভেতরটা। পমি, পমি। পমি কোথায় ?

এদিক ওদিক খুঁজলো। গাড়ী তখনও চলছে। ওপরের বার্থ, বেঞ্চির নীচে সর্ব্বত্র খুঁজে দেখলো। পমির স্যাণ্ডাল জোড়াও তো নেই।

—পমি, পমি। অনুপমা, অনুপমা। চিৎকার করে ডাকলো ও।

ওদিক থেকে কে বললে, কা হইলন বাবু ?

কি হয়েছে ? কি হয়নি তাই বলো। সেই মেয়েটি কোথায় গেল ? পমি, অনুপমা কোথায় গেল ?

কিন্তু সকলেই নতুন। কেউ দেখেনি তাকে। আগের যাত্রীরা নেমে গেছে রাত্রে। এরা কেউ কোন মেয়েকে দেখেনি।

শুধু সেই লোকটি বললে, উ তো সমঝাতে টাটানাগারমে উতর গ্যই।

দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললো সুধীন। বড়ো দুর্ব্বল বোধ করলো নিজেকে। ধপ্ করে বসে পড়লো বেঞ্চিটার ওপর।

আচ্ছন্ন মন নিয়ে ফিরে এলো সুধীন।

সমস্ত শরীর জুড়ে লজ্জা, ভয়, বিস্ময়। কখনো আশঙ্কা, কখনো বা একটা ব্যর্থতার কান্না ওর বুক ঠেলে উঠতে চাইলো। কেন, কেন এমন হ'ল? উত্তর খুঁজে পায় না ও। যে মেয়ে স্বেচ্ছায় ওর কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল একদিন, রাতের বাতাসের মত কানে কানে ফিসফিস করে জানিয়েছিল গোপন মনের রঙিন বাসনাটুকু, ঘড়ির কাঁটা থেমে যেত যার অন্তরঙ্গ হাসির ঝর্ণায়, সে একদিন এমন অভিসারিকার মত হঠাৎ এসে দাঁড়াবে সুধীনের সামনে, ভয়চকিত করুণ চোখের দৃষ্টিতে আঁকবে এমন অভাবিত আবেদন, তা কোনদিন যদি বা ভেবেছে সুধীন তো পরক্ষণেই মনে হয়েছে ওর এ শুধুই স্বপ্ন বোনা।

কিন্তু তারপর এমন ভাবে সময়, সমাজ, সম্ভাবনাকে ফাঁকি দিয়ে যদি ছুটতেই সুরু করেছিল দু'জনে, তা হ'লে হঠাৎ থেমে পড়লো কেন অনুপমা! কেন সরে গেল নিঃশব্দে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না সুধীন, বুঝতে পারে না এ কোন রহস্য! অনুপমা কি কোনদিনই ভালোবাসেনি ওকে? শুধুই অভিনয়, শুধুই কৌতুক? নাকি অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অভিসারের ছদ্মবেশ পরে এসেছিল সে? কে জানে। এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো কোনদিনই খুঁজে পাবে না ও।

ফুলমাসীমা! সে রাত্রির ছোট্ট ঘটনাটুকু মনে পড়তেই ভয় আর লজ্জা এসে দেখা দিলো ওর মনে। ভাবলো, কি জবাবদিহি দেবে ও।

অনুপমা হঠাৎ সেচ্ছায় নেমে গেছে এ-কথা কি বিশ্বাস করবে কেউ? হয়তো কত কি ভাববে। সন্দেহের জাল ছিঁড়বে কি করে ও ফুল-মাসীমার মন থেকে? সব মিথ্যে, সব ফাঁকি এ-কথাই বা বোঝাবে কি করে। কোন লজ্জায়? এ যে নিজের কাছেই নিজের ছোট হয়ে যাওয়া। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি জানানোর পর হঠাৎ যদি বিফল হয়েছে খবর আসতো, তা হ'লেও এত লজ্জিত বোধ করতো না সুধীন।

হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তার বিদ্যুৎ বয়ে গেল সুধীনের চোখের সামনে দিয়ে। আপনা থেকেই শিউরে উঠলো যেন। তাও কি সম্ভব?

না, না, না। নিজের মনেই প্রতিবাদ করে উঠলো সুধীন। তা হ'তে পারে না, হতে পারে না।

ওর ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ অনুপমাকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেছে এ কল্পনা করাও যায় না। তা ছাড়া ট্রেণের কামরায় এতগুলো লোকের সামনে থেকে একটি মেয়েকে জোর করে কেউ নামিয়ে নিয়ে যাবে, আর এতটুকু শব্দ হবে না, ঘুম ভাঙবে না সুধীনের!

না, তা নয়। তার চেয়েও ভয়ানক একটা কল্পনায় কেঁপে উঠলো সুধীন।

হয়তো তাই। হয়তো মুহূর্ত্তের ভুলে, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় অনুপমা সব কিছু অকপটে বলে ফেলেছিল তার ফুলমাসীমার কাছে। আর তারই সহায়তায় বুকে সাহস পেয়েছিল। বিশ্বাসে ভর করে এগিয়ে এসেছিল সেদিন। কিন্তু তারপর, হয়তো সুধীন যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন হয়তো একা একা দুঃসহ চিন্তার জালে জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে। ভেবেছিল, ভুল, ভুল পথে এগিয়ে চলেছে ও। সংস্কার আর সন্দেহ এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল অনুপমার সামনে। হ্যাঁ, মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন চলন্ত ট্রেণ

থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জ্জন দেয়াও সহজ হয়ে ওঠে।

এত এত 'হয়তো'র সঠিক উত্তর কে দেবে!

ধনঞ্জয় ?

ফিরে আসার পর যথারীতি দেখা হ'ল তার সঙ্গে। কিন্তু কোন কথাই বললো না সে। কোন প্রশ্ন করলো না ধনঞ্জয়। কিছু-যে ঘটেছে তা যেন জানেই না। তবু ধনঞ্জয়ের ব্যবহারে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলো সুধীন। সেই হাসিখুশি ফুর্ত্তির মানুষটা যেন হঠাৎ বদলে গেছে।

কোন কথা বলে না, আসে, চুপচাপ বসে থাকে, আর বই-এর পাতা উল্টে যায়। এমনি করেই চলছিল দিনের পর দিন। দু'দিকেই সঙ্কোচ। সহজ হতে পারে না কেউ। সুধীনের ভয়, অনুপমার অন্তর্ধানের সঙ্গে ও যে জড়িত তা হয়তো টের পেয়েছে ধনঞ্জয়। সুধীনের সন্দেহ, অনুপমার অন্তর্ধানের গোপন খবরটা হয়তো চাপা দেয়ার চেষ্টাতেই এমন গাম্ভীর্য্য।

ক্রমশঃ আশঙ্কা আর লজ্জা কাটলো সুধীনের। কিন্তু বিস্ময় গেল না। কাজের ফাঁকে, ঘুম-ভাঙা ছিন্ন স্বপ্নের রাতে কখনোসখনো, আবার বই-এর পাতায় একাগ্র মনে ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ হয়তো বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ও। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি সুন্দর মুখ। কানে বাজে একটি সুমিষ্ট নাম। অনুপমা, অনুপমা। ছোট্ট নাম, মিষ্টি নাম। কিন্তু সে-নামে মধুপগুঞ্জণ নয়, বোলতার মত হুল্ উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেনাম—ওর কানের চারপাশে। মনে পড়ে যায় কয়েকটা ছোট ছোট টুকরো দৃশ্য, কয়েক টুকরো মৃত কথালাপ। অভিনয় ? এ সবই কি অভিনয় ? বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না।

ধনঞ্জয় কিন্তু শেষ অবধি চুপ করে থাকতে পারলো না। শান্ত

ঠাণ্ডা গলায় বললে, পমি, পমিকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চোখ তুলে তাকালো সুধীন। দেখলো, লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছে ধনঞ্জয়ের।

চুপ করে রইলো ও, শুনলো সব কথাগুলো, যে কথা ও নিজেও জানে, যা শোনার জন্যে ও এতটুকুও উৎকণ্ঠিত ছিল না। যা জানতে চায় ও, তা ধনঞ্জয়ও হয়তো জানে না। সে রহস্যের ইতিহাস সকলের কাছেই অজ্ঞাত।

—তুই কি কখনো, তুই কি তাকে ভালবেসেছিলি সুধীন? কাঁপা কাঁপা গলায়, দীর্ঘশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলো ধনঞ্জয়।

ও শুধু হেসে উঠলো, উত্তর দিল না। কিই বা উত্তর দেবে এ-প্রশ্নের!

—জানিস সুধীন! হতাশার স্বরে ধনঞ্জয় বললে। মাঝে মাঝে বড়ো দুঃখ হয়। মনে হয়, পাগল হয়ে যাবো।

নিজের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে সচেষ্ট হাসি হেসে সুধীন বললে, প্রেমে পড়লে ও-রকম মাঝে মাঝে মনে হয়!

—না রে। পমিটার জন্যে বড়ো···কি যে হ'লো, কোথায় গেল, একটা খবরও জানিয়ে গেল না।

—হুঁ।

একটা দীর্ঘশ্বাস, কপট নয়।

হঠাৎ সুধীনের হাতটা জড়িয়ে ধরলো ধনঞ্জয়, তার দু'হাতের মুঠোর মধ্যে। সুধীন অনুভব করলো, থরথর করে কাঁপছে ধনঞ্জয়।

দু'হাতের মুঠোয় সুধীনের হাতটা চেপে ধরে ও বলে উঠলো, তোর, তোর কি মনে হয় সুধীন? আমি, আমি খুন করতে পারি? খুন করতে পারি কাউকে!

—কেন, এ কথা কেন বলছিস! সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো সুধীন।

—হ্যাঁ, আমিই খুন্ করেছি পমিকে। খুন করেছি।

—কি বলছিস? কি বলছিস তুই? ধনঞ্জয়ের কাঁধে ঝাকানি দিয়ে প্রশ্ন করলো সুধীন।

ধনঞ্জয়ের তন্ময়তা ভাঙলো। বললে, কি সন্দেহ হয় জানিস সুধীন? সন্দেহ হয় পমি হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে শুধু আমার অপরাধে।

—আত্মহত্যা! চমকে উঠলো সুধীন। তা হ'লে সত্যিই কি চলন্ত ট্রেণ থেকে ঝাপিয়ে পড়েছিল অনুপমা! হয়তো তাই। যে লোকটা বলেছিল, অনুপমাকে নেমে যেতে দেখেছে, সে হয়তো অন্য কারো কথা বলেছে। অনুপমা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ট্রেণ থেকে তখন হয়তো কোন লোকই ছিল না গাড়ীতে, পরের ষ্টেশনে উঠেছিল তারা।

ধনঞ্জয় আবার ফিসফিস করে বললে, আমিই দায়ী। আত্মহত্যা নয়, আমিই খুন করেছি তাকে।

—তুই? তুই দায়ী? কেন? কি করেছিলি তুই? মোহগ্রস্তের মত বারবার ঘাড় নাড়লো ধনঞ্জয়, কোন উত্তর দিলো না। ধীরে ধীরে মাথা তুললো ও, তারপর জানালায় আকাশের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইলো নিষ্পলক চোখে।

ট্রেণ চলে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। তখনও ট্রেণের পিছনের শেষ লাল আলোর বিন্দুটার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলো অনুপমা। যেন সুধীনের মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

কি একটা শব্দে চমকে ফিরে তাকালো ও। দেখলো, কোত্থেকে একরাশ জমাট অন্ধকার এসে নেমেছে প্লাটফর্মের ওপর। এত আলো, এত কোলাহল কোথায় মিলিয়ে গেছে। শুধু নিঃসঙ্গ একাকী দাঁড়িয়ে আছে ও জারুল গাছের নীচে।

কিছুই তো ভাবেনি ও, পথ খুঁজে নেয় নি। কি করবে এখন?

ধীরে ধীরে ওয়েটিং রুমের দিকে পা বাড়ালো ও। আজ রাত্রির মত এইটুকু পান্থবাস পেলেই যথেষ্ট। জীবনের মোড় যদি ঘোরাতেই হয় তার জন্যে অনেক সময় পড়ে আছে।

অদ্ভুত একটা আনন্দ অনুভব করলো অনুপমা। ওর শোণিত-শিরার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন খুশির বুদ্বুদ উঠলো।

ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো ও।

এমনি ক্লান্তিতেই ট্রেণের কামরায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সুধীন। আর তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কি ভেবেছিল অনুপমা। ক্রমশই যেন এক অসহ্য চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিল ও। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সমস্ত শরীর, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সারা মন। কি করবে, কি করবে অনুপমা? একবার উঠে দাঁড়িয়েছে ও, আবার পরক্ষণেই হতাশার চোখে তাকিয়েছে ঘুমন্ত সুধীনের মুখের

দিকে, বসে পড়েছে মনের শ্রান্তিতে। খোলা জানালায় মুখ রেখে কখনো চোখ বুজে রাখার চেষ্টা করেছে, কখনো বা জানালার চৌকা অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে দেখেছে দু'চারটে জোনাক-জ্বলা আলো। না থামা ষ্টেশনের পাশ দিয়ে ছুটে গেছে ট্রেণ। এক একবার ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়তেও ইচ্ছে হয়েছে ওর। ভেবেছে, জীবনের পাতায় ইতি টেনে দিলে হয়তো শান্তি মিলবে, রেহাই পাবে ও সব দুশ্চিন্তা থেকে। তারপর হঠাৎ একটা আলো ঝলমল্ ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো ট্রেণখানা। মাঝরাতের ষ্টেশনে ম্লান কলরব শোনা গেল। তবু ঘুম ভাঙলো না সুধীনের। এতখানি মানসিক চাঞ্চল্যের ফলে হয়তো বা ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে, ভাবলো অনুপমা। বারবার তাকিয়ে দেখলো সুধীনের মুখের দিকে। না, ঘুমিয়ে পড়েছে ও। কিছুতেই টের পাবে না ও।

হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে উঠলো অনুপমা। ওর মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো অনুপমা। তারপর গাড়ি ছাড়ার শেষ ঘন্টি বাজতেই দরজা খুলে টুপ করে নেমে পড়লো।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে এলো ওর বুক থেকে, ট্রেণটা ছেড়ে দিতেই।

ওয়েটিং রুমের খোঁজে পা বাড়াতে বাড়াতে আরেকবার ফিরে তাকালো ও দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া ট্রেণের রক্তপুচ্ছ আলোর বিন্দুটার দিকে।

তারপর মনে মনেই বললে, ফুলমাসীমাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে। নাম ঠিকানা না দিয়ে। শেষে ও বেচারীর দোষ না দেয় যেন সবাই!

পমির হঠাৎ মনে হ'ল ও যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে জীবনের।

সামনে অফুরন্ত পথ, অথচ কোথায় তার শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিছনের কপাট তো নিজের হাতেই বন্ধ করে ফেললো ও।

প্রৌঢ় রাতের স্বল্পালোক প্লাটফর্মে হাঁটতে হাঁটতে পমির চোখ পড়লো দূরের আলো-ঝল্‌মল্‌ শহর আর লাল আগুনের আকাশের দিকে। ঘন অন্ধকারের গায়ে যেন তারার মালা। আকাশে রক্তের ছিটে। রাত্রির চাঁদোয়াতেও যেন যন্ত্রের ঔদ্ধত্য ছড়িয়ে পড়েছে। এতদিন শুনেই এসেছে পমি, আজ প্রথম দেখলো। ফারনেসের অগ্নিকুণ্ডটা যেন কল্পনার চোখে দেখতে পেলো। চিম্‌নির মুখ থেকে, ধোঁয়া নয়, যেন আগুনই ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে। আর সেদিকে তাকিয়ে শহর আর যন্ত্রের বিরাটত্ব অনুভব করলো পমি, নিজের ওপর যা কিছু ভরসা সব যেন হারিয়ে ফেললো।

ধীরে ধীরে ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল ও

লোকজন কম। দু'চারজন ষ্টেশনের কর্ম্মচারী। কালো কোটে পিতলের বোতাম আঁটা একজন বারবার ফিরে ফিরে তাকালো পমির দিকে। ষ্টেশনের ম্লান-জ্যোৎস্না বিচিত্র আলোয় লোকগুলোকে কেমন ভিন্ন জগতের, অচেনা অচেনা মনে হ'ল ওর।

এসে ঢুকলো ও ওয়েটিং রুমে।

প্রথমে মনে হয়েছিল নির্জ্জন। বেঞ্চির এক কোণে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসলো পমি, তারপরই চোখে পড়লো অন্য কোণে আরো একজন বসে আছেন। মহিলার বেশবাস দেখে পমি বুঝলো, অবাঙালী।

তাই আলাপ জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করলো না। কথা বলার মত মনের অবস্থাও নয় তখন ওর। বিরাট একটা শূণ্যের মধ্যে দুলছে যেন।

চুপ করে বসে রইলো পমি। আর ক্রমশঃ যত রাজ্যের চিন্তা

এসে জড়ো হ'ল ওর মনের চারপাশ ঘিরে। সমস্ত বুকে কি যেন এক অবোধ্য ব্যথা। চোখ ছাপিয়ে জল নামতে চাইলো ওর। এতক্ষণ শক্ত হয়ে নিজেকে ঠিক্ রেখেছিল পমি। হয়তো নিঃসঙ্গতার জন্যে, হয়তো বা সামনে পথ না খুঁজে পেয়ে, হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো ও। বেঞ্চির হাতলে মাথা রেখে লুকিয়ে কাঁদলো ও। কাঁদলো আর কাঁদালো। হাতে মাথা গুঁজে পড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর উৎকট একটা গন্ধ নাকে আসতেই আঁচলে চোখ মুছে মাথা তুললো ও।

সোডার বোতল খোলার শব্দ এলো। দেখলো, ও কোণের প্রৌঢ়া হাতে কাঁচের গ্লাস নিয়ে নিজের মনেই হাসছেন।

হঠাৎ যেন ভয় পেলো পমি। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, বোধহয় পাঞ্জাবীনী।

বিস্মিত হ'ল ও। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো সেদিকে, আর চোখোচোখি হ'তেই ইশারায় পমিকে ডাক দিলো মহিলাটি।

সে ডাকে সাড়া দেবার সাহস হ'ল না পমির। চুপ করে বসে রইলো।

কিন্তু পাঞ্জাবীনী না-ছোড়। এক হাতে গ্লাস এবং অন্য হাতে বোতল নিয়ে টলতে টলতে ওর কাছে এগিয়ে এলো। এসে বসলো ঠিক পমির পাশে।

ভাঙা ভাঙা বাংলা না জিভের জড়তা বোঝা গেল না। সুর করে টেনে টেনে বললে, বাংগালী! ফাইন! আর্টিষ্টিক জাত বাংগালীরা। আপন নাম কি আছে?

ভয়ে ভয়ে নাম বললো পমি।

—ফাইন। তুমাকে অ্যানি ডাকবো।···চলবে? বলে একবার বাঁ হাতের বোতলটা এগিয়ে দিতে গিয়ে ফিরে নিয়েই ডান হাতের

গেলাসটা এগিয়ে দিলো।

সঙ্কুচিত হয়ে দুরে সরে যাবার চেষ্টা করলো পমি।

—আমি একটা জিনিয়াস আছি। আর্টিষ্ট। আর্টিষ্টরা সব জিনিয়াস আছে।

বলেই টলতে টলতে এক হাতে বোতল আর এক হাতে গ্লাস নিয়ে উঠে গেল সে।

বললে, আমি রাজেন্দ্রাণী সিং—এ জিনিয়াস অফ দি ফার্স্ট অর্ডার। বলেই ধপ্ করে বসে পড়লো। হাতের গ্লাস আর বোতল নামিয়ে রেখে স্যুটকেশটা খুললো। কাপড় জামা সব ছড়িয়ে ফেলে কি যেন খুজতে স্থরু করলো। তারপর হারানো জিনিস খুঁজে পেয়ে সশব্দে হেসে উঠলো রাজেন্দ্রাণী।

আবার টলতে টলতে ফিরে এলো অনুপমার কাছে। তারপর হঠাৎ একহাতে জড়িয়ে ধরলো পমিকে, আর অন্যহাতে একটা ছোট্ট ফটো তুলে ধরলো পমির চোখের সামনে।

—ইজ্‌ণ্ট হি নাইস ? আমার বাংগালী লাভার আছে।

ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই কিন্তু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল পমি।

না সহায়, না সম্বল। কি করবে পমি, কোথায় যাবে, তার ঠিকঠিকানা নেই বলেই যে রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গ নিতে রাজি হ'ল ও তা নয়।

রাতের আলোয় যাকে দেখে ভয় পেয়েছিল ও, দিনের বেলায় তাকেই দেখলো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। কোন ফাঁকে যেন নেশায় ঝিমোতে সুরু করেছিল পাঞ্জাবী মেয়েটি, বেশবাস হয়ে পড়েছিল বিস্রস্ত। তারপর ভোরের দিকে উঠে বসলো সে স্বাভাবিক মানুষের মতই, হাতমুখ ধুয়ে পোষাক বদলে এসে আলাপ জুড়ে দিলো পমির সঙ্গে। ক্ষমা চেয়ে নিলো রাতের দুর্ব্যবহারের জন্যে।

ক্রমশঃ, কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো।

—কোথায় চলেছো বহিন? জিগ্যেস করলো পমিকে।

পমি বললে, চাকরীর খোঁজে।

—নাম কি তোমার? বিয়েসাদী করেছো?

বিষণ্ণ হেসে পমি বললে, অনুপমা। অনুপমা আমার নাম।

—আর স্বাওমী?

মাথা নাড়লো ও।

রাজেন্দ্রাণী হেসে বললে, বহুৎ ঠিক্। চাকরী মিলে যাবে। আমার সঙ্গে হারদোয়ারে যাবে?

—যাবো। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কিছু না ভেবে উত্তর দিলো পমি, অনুপমা।

মনকে বোঝালো, এ ছাড়া আর গতি কি এখন। নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। যাকে পরম বন্ধু, পরম আত্মীয় বলে জেনেছিল সেই যখন—

অনুপমা নিজের মনেই হাসলো। এখন আর মানুষকে ভয় করার কি আছে। সব ভয় ভেঙে গেছে ওর, সব আশঙ্কা অতিক্রম করে এসেছে।

কিন্তু মনকে যাই বোঝাক্ না কেন, আসলে সেই ছোট্ট ছবিটার আকর্ষণে রাজেন্দ্রাণীকে অনুসরণ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করলো না। যে সন্দেহ জেগেছে তার কপাট খুলে দেখতেই হবে। হয়তো দেখবে ওর সন্দেহ মিথ্যে, ও ছবি হয়তো বা অন্য কারও। কে জানে!

তবু রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হরিদ্বারে চলে এলো ও, এসে উঠলো কখলে—রাজেন্দ্রাণীর বাড়ীতে।

আর এসে পৌঁছেই চিঠি লিখলো ঃ ফুলমাসীমাকে। ঠিকানা গোপন রেখে।

লিখলো, 'আমার জন্যে ভেবো না। পথ খুঁজে পেয়েছি। একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে যে আরো একরাশ ভুল করে বসিনি এটাই ভাগ্য। সুধীনদাকে দায়ী ক'রো না এর জন্যে, কিছুই জানেন না উনি। আর, আর ফুলমাসীমা, তুমি তোমার নিরুদ্দেশ স্বামীর জন্যে হা হুতাশ করে জীবনকে ক্ষয় ক'রো না, আশায় আশায় বসে থেকো না তার পথ চেয়ে। তিনি হয়তো ফিরবেন না, ফিরলেও তাকে গ্রহণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

এর চেয়ে স্পষ্ট করে লিখতে পারলো না ও। কিন্তু ফুলমাসীমাকে আশা ছাড়তে বললেও নিজে নিরাশ হ'ল না।

বাড়ীর দারোয়ান ফটক খুলে সেলাম করতেই রাজেন্দ্রাণী বললে,

এই আমার গরীবখানা অনুপমা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এই কোঠিতে কয়েদ থাকতে হয় আমাকে। তাই তুমি আমার সহেলী হবে। এই তোমার চাকরী।

এত কথা অবশ্য কানে গেল না অনুপমার। বিরাট প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই কানে বাজলো ওর—গরীবখানা।

আর এই গরীবখানার চেহারা দুদিনেই বদলে ফেললো অনুপমা। কিন্তু সুন্দর প্রতিমাই গড়তে পারে মানুষ, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বিরাট বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে তাই মনপ্রাণ খাঁ খাঁ করে উঠতো অনুপমার। আর আশ্চর্য্য চরিত্রের মেয়ে এই রাজেন্দ্রাণী। কেমন যেন অবোধ্য ঠেকতো অনুপমার কাছে।

ক্রমে ক্রমে সবই জানতে পারলো ও। কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ে ছিল রাজেন্দ্রাণী। বাপ মারা যাওয়ার পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে বসেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করতে পারতো সে যে কেন সন্ধ্যে হ'লেই নিজেকে সুরার পানে ডুবিয়ে ফেলে, কেনই বা অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে চলে এই বয়সেও, বুঝতে পারে না অনুপমা। এক একদিন রাজেন্দ্রাণী যখন মূল্যবান পোষাকে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, মুগ্ধ চোখে, হয়তো বা ঈর্ষার চোখেও তাকিয়ে দেখে অনুপমা। বয়স আর অত্যাচারের সব কালিমার ভেতর থেকে সুস্ফুট একটি গোলাপের মত উঁকি দিয়ে ওঠে রাজেন্দ্রাণীর রূপ। সুঠাম স্বাস্থ্যের যৌবন, ভোরের রোদ ঝলকানো তুষারশৃঙ্গের ঈষৎ লালিমার ছায়া তার মুখে, উন্মুক্ত বাহু আর আকণ্ঠ যৌবনতরঙ্গ। বেশবাসে ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি। কিন্তু সলমাচুমকির ওড়না, সাটিনের রঙিন শালোয়ার, জড়ির কাজ করা রেশমী জঙ্ঘাবরণ—সবকিছুকে ছাপিয়ে ফুটে উঠতে চায় একটি ম্লানমুখা

যৌবন। এই রূপ আর এমন ঐশ্বর্য্য পেয়েও কেন যে রাজেন্দ্রাণীর জীবন ব্যর্থ হ'ল অনুপমা খুঁজে পায় না। খুঁজে পায় না বলেই নিজের জীবনটাও দুর্ব্বিষহ মনে হয় তার। এত বড় বাড়ীটা তারই অধিকারে যেন, দাসদাসী শোফার দারোয়ান সকলেই সম্মান করে, তার সুখ-সুবিধের দিকে নজর দেয় রাজেন্দ্রানী স্বয়ং, তা সত্ত্বেও যেন পালিয়ে বাঁচতে চায় অনুপমা।

দোতলার বড়ো হল্ ঘরটায় বসে বসে সময় কাটায় ও। দেখে চারিধারে থরে থরে সাজানো অসংখ্য বই। ইংরেজী আর অন্যান্য ভাষা। উল্টে পাল্টে ছবি দেখে অনুপমা, কখনো বা দু'চার পাতা পড়তে চেষ্টা করে।

আর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় নিজের। মনে হয় যেন বিরাট বাড়ীখানা একটি ব্যর্থ মৌচাক। আর তার মক্ষিরানী এই রাজেন্দ্রাণী।

দিনে দিনে নতুন মুখ দেখে, শুধুই পুরুষের মুখ। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও করিয়ে দেয় রাজেন্দ্রাণী। প্রথম প্রথম ভয় হ'ত, কিন্তু ক্রমশঃ ভয় ভেঙে গেল। শুধু একজন ওকে ভাবিয়ে তুললো, ভয় বাড়ালো ওর।

কুলবন্ত।

ছিমছাম চেহারা। কোনদিন হকি ষ্টিক হাতে, কোনদিন বা টেনিস র‍্যাকেট হাতে ফিরতো সে রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কাটাতো। আর রাজেন্দ্রাণী অনুপমাকেও ডাকতো তখন।

প্রথম প্রথম পুতুলের মত চুপচাপ বসে থাকতো অনুপমা, 'হ্যাঁ না' বলে ছোট্ট উত্তর দিতো প্রশ্নের। কিন্তু কুলবন্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেত কখন, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো অনুপমার মুখের দিকে। লজ্জিত হয়ে পড়তো ও, দেখতে পেতো রাজেন্দ্রাণীর মুখের

রঙ বদলে যাচ্ছে।

অস্বস্তি বোধ করতো অনুপমা, কিন্তু কিছুই বলতে পারতো না। এদিকে অন্য এক রহস্য, গোপন গ্লানিকেও আর যেন চেপে রাখা যায় না। কি করবে কিছুই বুঝতে পারতো না। এক একসময় মনে হ'ত সমস্ত গোপনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রাজেন্দ্রাণীকে বলে ফেলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর বলে উঠতে পারতো না।

কি করে বলা যায় কথাটা, কি করে সুরু করা যায়। অনুপমা জানতো, রাজেন্দ্রাণীর চোখে এ অপরাধ অপরাধই নয়। তবু সাহস হ'ত না। মনে হ'ত, হয়তো এই আশ্রয়টুকুও হারাতে হ'বে এ অপরাধের জন্যে।

একদিন বন্ধু-মুহূর্ত্তে রাজেন্দ্রাণী প্রশ্ন করলো, বিয়ে সাদী করবে না সহেলী?

অনুপমা হাসলো।—সে পথ বন্ধ করেই এসেছি। কিন্তু তুমি কেন বিয়ে করো নি? এ ভাবেই কি জীবনে সুখ পাওয়া যায়?

—সুখ? হাসলো রাজেন্দ্রাণী। বললে, সুখের মুখ এ জীবনে একবারই দেখেছিলাম বহিন।

—কুলবন্তকে বিয়ে করো না। মৃদু হেসে বললে অনুপমা।

হো হো করে হেসে উঠলো রাজেন্দ্রাণী। বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললে, তোমার কি ধারণা কুলবন্তের প্রেমে পড়েছি আমি?

—তবে?

রাজেন্দ্রাণী হসেলো। সোডা ঢালতে ঢালতে বললে, আমি চাই পৃথিবীর সব পুরুষ আমার প্রেমে পুড়ে মরুক। আমার জীবনে মহব্বৎ আনতে চাই না।

—কেন ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো অনুপমা।

নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো রাজেন্দ্রাণী, তারপর ধীরে ধীরে গলার লকেটটা তুলে ধরলো অনুপমার চোখের সামনে। একপাশে চাপ দিতেই ডালা খুলে গেলো লকেটটার। অনুপমা দেখলো সেই ছবি, সেই চেনা মুখ। প্রথম দিনেই যার ফটো দেখিয়েছিল রাজেন্দ্রাণী, যার টানেই হয়তো এতদূর পাড়ি দিয়েছিল ও।

বললে, কোথায় ইনি ? আসেন না তো এখানে।

রাজেন্দ্রাণী হেসে উঠলো।—আমাকে পুড়িয়েছিল এ, তাই পুরুষ জাতটাকে পুড়িয়ে মারছি আমি। এত এত লোক আমার কাছে আসে, কিন্তু তার মুখ মনে পড়ে বলেই কেউ স্পর্শও করতে পায় না আমাকে। শুধু—শুধু রাত হ'লেই এই হুইস্কির নেশায় ভুলে থাকতে হয় সব কিছু।

অনুপমা বললে, তুমি মদ খাও ওরা জানে ?

রাজেন্দ্রাণী হাসলো।—না। দুর্নাম ? দুর্নামের ভয়ে জানাই না ভাবছো ? তা নয়। যে মদ খায় তাকে সহজে কাছে পাওয়া যায় ভাবে সবাই। হয়তো আপনা থেকেই সরে যাবে ওরা তখন। জানে না, যে মদ খায় না তাকে প্রেমের নেশা ধরানো যায়, কিন্তু মাতালকে প্রেমের ইশারায় ডাকা যায় না।

আবার লকেটের ছবিটা তুলে ধরলো রাজেন্দ্রাণী। বললে, যাবে এর কাছে, যাবে এক দিন ?

—যাবো। কোথায়, কোথায় থাকেন ইনি ?

রাজেন্দ্রাণী হাসলো। বললে, লছমনঝোলায় কালি কম্‌লির চটিতে। সাধু হয়ে গেছেন—সন্ন্যাসী। তাই বিয়ে করা হ'ল না আমার। ফ্লার্ট করে বেড়াই, আর রাত হ'লেই এই আমার সহেলী। ব'লে হুইস্কির

বোতলটা তুলে ধরলো।

—কিন্তু তুমি বিয়ে করো নি কেন? হঠাৎ প্রশ্ন করলো রাজেন্দ্রাণী।

চুপ করে রইলো অনুপমা। উত্তর দিতে পারলো না। আর চোখের কোন থেকে দুবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়লো অনুপমার। রাজেন্দ্রাণী দেখলো। ওর নিজের চোখও বুঝি ছলছল করে উঠলো।

হঠাৎ কেঁদে উঠলো অনুপমা। টেবিলে মাথা রেখে বললে, আমারও জীবন শেষ হয়ে গেছে বহিন।

—কেন? কি হয়েছে?

একে একে সব বলে গেল অনুপমা। গ্লানির কথাও।

রাজেন্দ্রাণী শুনলো, ওর চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়লো।

বললে, ভয় নেই অনুপমা। ভয় নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমি তো আছি বহিন। আর, আর—

আবার লকেটটা তুলে ধরলো রাজেন্দ্রাণী। বললে, চলো, ওর কাছে চলো তুমি। গেলে শান্তি পাবে।

অনুপমা চোখ তুলে তাকালো রাজেন্দ্রাণীর দিকে।—কি বলছো তুমি, সাধু সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস করো নাকি?

রাজেন্দ্রাণী বললে, জানি না সাধু মহান্ত বলে, না পিয়ার ছিল বলে, কিন্তু সত্যিই শান্তি পাই ওর কথা শুনে। মাঝে মাঝে যাই আমি, তুমিও চলো।

তাই গেল একদিন অনুপমা। সাদা সিধে পোষাকে রাজেন্দ্রাণীও গিয়ে উঠলো লছমনঝোলার চটিতে।

হিমালয়ের পা ধুয়ে ঝরে পড়ছে খরস্রোতা গঙ্গা—শীর্ণ অথচ দ্রুত স্রোতা। পাহাড়ের গায়ে সরু পথ, আর এক পাশে প্লাবনের বেগে বয়ে চলেছে সদ্য নামা গঙ্গা। যেন মুক্তির আনন্দে ঝরে পড়ছে।

এসে নামলো অনুপমা আর রাজেন্দ্রাণী। চারপাশে তাকিয়ে দেখে অনুপমার মনে হ'ল ও যেন সত্যিই পৃথিবীর সব দুশ্চিন্তা থেকে, আপন সত্ত্বার অনুভব থেকেও মুক্তি পেয়ে গেছে। এমন স্বচ্ছ আকাশ, এমন তরল কাচের মত জল যেন আর কখনো দেখেনি ও। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট্ট একটি চটি—কালি কম্লির চটি। নোংরা মলিনতায় ঢাকা সাধু সন্ন্যাসীর ভিড়—নানা দিক দেশের। আর দু'চারজন শহুরে তীর্থাকাঙ্খী। গঙ্গার সরু বুকের ওপর কংক্রিট আর মোটা তারের ঝুলন্ত ব্রিজ। ওপাশে হিমালয় হঠাৎ যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। খুব সরু একটা পথ—স্বর্গদ্বারের পথ। আর ওপাশের ব্রিজের মুখটার ঠিক পাশেই চূড়া থেকে নেমে এসেছে একটি শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণার রেখা। কালো পাথরের বুকে সুদীর্ঘ একটি শ্বেত-রেখা যেন হিমালয়ের জটাজালের ফাঁকে শীর্ণ একটি সাদা সিঁথি।

রাজেন্দ্রাণী বললে, এই গঙ্গা।

অনুপমা হেসে বললে, এই প্রথম দেখলাম। আমাদের দেশের গঙ্গা এরচেয়ে অনেক চওড়া, সরু নালার মত নয় এমন।

রাজেন্দ্রাণী হাসলো।—হ্যাঁ, কিন্তু তার স্রোত যেন নির্জীব। আর এ জলে এক হাঁটু নামতেও ভয় হবে তোমার। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায় তার ঠিক নেই।

পাড়ে দাঁড়িয়ে এক আঁজলা জল তুলে বললে, আর দেখেছো কি পরিষ্কার। এতে স্নান করলে শুধু শরীর নয়, মনও পরিষ্কার হয়ে যায়।

পাহাড়ের গায়ে সিঁথির মত সরু দাগটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অনুপমা প্রশ্ন করলো, ওটা কি ?

—ওটা ? ঝর্ণা শুকিয়ে গেছে। এক সময় এই ব্রিজ ছিলো দড়ির ঝুলন্ত সাঁকো। তাই লছমনঝোলা নাম। ঐ ঝর্ণা নেমে আগের

সাঁকোটা ধুয়ে উড়ে গেছে।

স্নান করে অন্তর্বাসহীন গরদের সাড়ীতে শরীর ঢেকে বাংগালী সান্তের কাছে গিয়ে পৌঁছতে তিনিও ঐ ঝর্ণার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এ লছমনঝোলা, এই পাহাড়—এ সবই নিয়মের জগতের বাইরে। এখানে সকলেই নিজের নিয়মে চলে, অপরের কথায় নয়। নিজের নিয়মে চলাতেই পরম শান্তি। সে নিয়ম প্রাণের আবেগে তার নিজের পথ করে নেবে। বুদ্ধি দিয়ে, পাঁচজনের কথা ভেবে যে রাস্তা বানিয়ে নেয় সে হয়তো অপরের ক্ষতি করে না, কিন্তু অপরকে লাভ করতেও দেয় না।

এমনি অনেক কথাই বললেন তিনি। কিন্তু সে সবের দিকে কান গেল না অনুপমার। ও শুধু শৈশবের স্মৃতি মন্থন করে চেষ্টা করলো বাংগালী সান্তের চেহারার মধ্যে ফুলমাসীমার হারানো স্বামীকে চিনতে পারে কিনা দেখবার জন্যে।

অনুপমা বাঙালী, একথা শুনে হয়তো একরাশ স্মৃতি তাঁরও মনে জেগে উঠলো। নানা কথার ফাঁকে অনুপমা বুঝতে পারলো সন্দেহ মিথ্যে নয়।

ফিরে এসেই চিঠি লিখলো। 'ভুল বলেছিলাম তোমাকে। ফিরে গেলে গ্রহণ করতে পারবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ফিরে যাবেন না হয়তো কোন দিন।'

ক্রমশঃ কি যেন আকর্ষণ বোধ করলো অনুপমা। প্রায়ই যাতায়াত সুরু করলো বাংগালী সান্তের কাছে।

সেদিনও ফিরে এসে স্তব্ধ মন নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল ও। হঠাৎ নিঃশব্দে কখন কুলবন্ত এসে দাঁড়ালো ওর পিছনে।

ফিসফিস করে কি যেন বললো সে, একটি হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতে গেল অনুপমাকে।

আর পরমুহূর্ত্তেই ক্রুদ্ধস্বরে ডাক দিলো রাজেন্দ্রাণী।—কুলবন্ত!

ছিট্‌কে সরে গেল কুলবন্ত। হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আর একটা কথাও বললো না রাজেন্দ্রাণী। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল কুলবন্ত।

হুইস্কি আর সোডার বোতল খোলার শব্দে ঘরে ঢুকে অনুপমা দেখলো, গ্লাসের পর গ্লাস উজাড় করে চলেছে রাজেন্দ্রাণী, ও কাছে আসতেই যেন ক্ষেপে গেল সে। হঠাৎ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো বোতল আর গ্লাস।

—গেট আউট, গেট আউট। ভাগো হিঁয়াসে। নিকাল যাও।

বলে এগিয়ে এসে একটা ধাক্কা দিলো সে অনুপমাকে।

—আমার মহব্বৎ ছিনিয়ে নিতে চাও তুমি। ভাগো, চলে যাও যেখানে খুশি। বলে আবার একটা ধাক্কা দিয়ে কপাটের বাইরে বের করে দিলো অনুপমাকে।

সেই রাত্রেই অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লো অনুপমা। গঙ্গার ধারে ধারে হাঁটা পথে লছমনঝোলা পৌঁছতে আর কতদিন লাগবে!

সিদ্ধিমাতার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সুধীনের সামনে পড়ে গেল ইন্দিরা।

এক মুখ হেসে বেণী দুলিয়ে বললো, চিনতে পারছেন?

সুধীন তখনও তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। ধনঞ্জয়, অনুপমা, ফুলমাসীমা! ফেলে আসা দিনের কত কথাই না ঘূর্ণীর মত ওর মনকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

তাই ইন্দিরার কথা শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়েও ঠিক্ চিনতে পারলো না যেন।

ইন্দিরা হেসে বললে, জানতাম। চিন্'তে পারবেন কেন! রাণু-মামীমাকে চিঠি লিখলাম তাও তো জবাব পেলাম না, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?

এতক্ষণে চিনতে পেরেছে সুধীন। বললে, তোমাকে চিনতে পারবো না?

—কে বলুন তো?

সুধীন হাসলো।—কেন, তুমি তো সেই 'ট্রিকৃটা শিখিয়ে দিলেন না'?

ইন্দিরাও হেসে ফেললো। বললে, রাণুমামীমাকে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন আমাদের বাসায়। কৈ গেলেন না তো?

সুধীন বললে বেশ যাবো একদিন।

—না একদিন না আজই চলুন। বলে একটা হাত ধরলো সুধীনের। খানিক চুপ করে থেকে সুধীন বললে, বেশ চলো।

সমিতা আর বাণীকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেলো না ইন্দিরা। তাদের ফেলে রেখেই বাড়ীর পথ ধরলো দু'জনে।

পাশাপাশি পথ হাঁটতে হাঁটতে ইন্দিরা হঠাৎ বললে, সিদ্ধিমাকে চেনেন আপনি?

—কেন বলো তো!

ইন্দিরা হাসলো। বললে, না এমনি মনে হ'ল। আচ্ছা, উনি নাকি কোন রাজার মেয়ে? এম এ পাশ করার পর নাকি সন্ন্যাসী হয়েছেন?

সুধীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কি জানি!

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।

—হাসছো যে? সুধীন প্রশ্ন করলো।

ইন্দিরা ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি লুকোতে লুকোতে বললে, আমার পাশে কে যেন তখন বললো, উনি বাঙালী, কোন একটা ছেলের সঙ্গে নাকি···মানে···ইয়ে···পালিয়েছিলেন।

—বললো? কে? উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো সুধীন। বললে, কেমন দেখতে তাকে?

—তা তো দেখিনি। একজন ভদ্রমহিলা।

—দেখোনি! কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠলো সুধীন।—কপালে কাটা দাগ আছে ঠিক নাকের ওপর?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়লো। বললে, দেখিই নি ভালো করে।

তবু কেমন যেন উদভ্রান্ত লাগলো সুধীনকে। ফুলমাসীমা? ফুল-মাসীমা হয়তো। ধনঞ্জয়, অনুপমা, ফুলমাসীমা। পুরোনো দিনের কথা-গুলোই যেন বারবার ওর মনের পাশে চক্র দিয়ে গেল। অনুপমা আর সুধীন। দু'জনে চলেছে, রাতের ট্রেণে ছুটে চলেছে কোন

এক অজানা সুখের নীড় খুজতে। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল সুধীনের। দেখলো অনুপমা নেই। কিন্তু কোথায় গেল অনুপমা, কেনই বা নেমে গেল একটি কথাও না জানিয়ে? সে রহস্যের হদিস পায় নি সুধীন। আর তারই হারানো চাবিটা খুঁজে বের করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো ও। ঐ একটাই চিন্তা বারবার ওর মনের মধ্যে তোলপাড় সুরু করলো। তাই ইন্দিরাদের বাড়ীতে পৌঁছেও ভালো করে আলাপ করতে পারলো না সুধীন। ইন্দিরার বাবার কথাগুলো শুনলো না ভালো করে হয় তো। কোনরকমে দু'চারটে কথা বলেই চলে এলো ও।

রাস্তায় নেমেই আর কোন কথা মনে রইলো না। সোজা গিয়ে ট্রামে উঠলো। ফুলমাসীমা! ফুলমাসীমার বাড়ীর ঠিকানাটা মনে না থাকলেও বাড়ীটা চিনতো ও ভালো করেই। আজ এতদিন বাদে সুধীনকে দেখে হয়তো আশ্চর্য্য হবেন তিনি। হয়তো···

ট্রাম থেকে নেমে চেনা রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়েই কেমন যেন অচেনা লাগলো সুধীনের। নতুন নতুন বাড়ী উঠেছে অনেকগুলো, নাম বদলে গেছে দোকানপাটের। আর লোহার রেলিং দেয়া যে জায়গাটায় সেকালে একরাশ ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াতো সেখানটায় ফেরিওয়ালা বসেছে কয়েকসারি। রাস্তার ধারে যেখানে সারিবন্দী ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াতো সেখানে গোটাকয়েক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঠিক্ গলিটার মুখে ঢুকতেই বিস্মিত হ'ল সুধীন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক ঠেলে। গলির এক ধারের বাড়ীগুলো ভেঙে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে মাটির সঙ্গে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কৃপায় একদিকের বাড়ীগুলো ভেঙে রাস্তা চওড়া হয়েছে, ওদিকে তখনও কয়েকটা বাড়ী ভাঙার কাজ চলছে পুরোদমে।

নিরুদ্দেশ ব্যর্থ মন নিয়ে সারা রাস্তাটা বারকয়েক পায়চারী করলো সুধীন। ফুলমাসীমার বাড়ীটা খুঁজে পেলো না। ইতিমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেটা।

হতাশ মন নিয়ে ফিরে এলো সুধীন। আর মনে পড়লো—ধনঞ্জয়, ফুলমাসীমা, অনুপমাকে।

মনে পড়লো অনুপমাকে হারিয়ে ফিরে আসার পর ধনঞ্জয়ের সেই ব্যথাম্লান মুখ।

মানুষই বদলে গেল যেন। সব সময় চুপচাপ বসে থাকতো ধনঞ্জয়, কথা বলতো না বড়ো একটা। আর যখনই বলতো কিছু, তাও অনুপমাকে ঘিরে।

বলতো, জানিস সুধীন। আমার মনে হয় পমি আত্মহত্যা করেছে। আর, আর আমার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে ও।

সুধীন হাসবার চেষ্টা করতো, আশঙ্কা দূর করতে চেষ্টা করতো ধনঞ্জয়ের। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও নিজেও জ্বলতো। ব্যথায় আর রহস্যের দীর্ঘশ্বাসে ভরে যেত ওর মন।

এমনি ভাবেই সেদিন সেই হোষ্টেলের বারান্দায় মুখোমুখি বসেছিল ওরা দু'জনে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

কিন্তু আর আর বন্ধুরা তো জানতো না কি ঘটে গেছে, কি ঘটতে চলেছে। ওরা তাসের আড্ডায় টেনে নিয়ে যাবার জন্যে এসে হাজির হ'ল।

—এই যে, নিতাই গৌর দুজনেই আছো দেখছি, চলো হে ক্লাসের আড্ডা বসেছে আমাদের।

ছুটির দিন হ'লেই ওদের ক্লাসের আড্ডা বসতো। আর সুধীনও যোগ দিতো সে আড্ডায়। কিন্তু তেমন মনের অবস্থা নয় ওর তখন।

বললে, না রে, আজ ভাল লাগছে না।

উত্তর এলো, না না, তুই না গেলে খেলা জমবেই না।

সুধীন হেসে বললে, মিছিমিছি কতগুলো টাকা হারবো বৈ তো নয়! ছেড়ে দে আজ।

হঠাৎ একজন বললে, হারবি! কক্ষনো না। প্রেম করেছিস কখনো?

—করিনি, প্রেমে পড়েছিলাম। সুধীন হাসলে।

—তারপর ব্যর্থতা, এই তো? হা হুতাশ। মেয়েটা ঠকালো কিম্বা ফিরেও তাকালো না। এই তো?

সুধীন হেসে বললে, প্রায়।

—তা হ'লে হারবি না। জানিস তো, লাক্ ইন কার্ডস আর লাক্ ইন লাভ একসঙ্গে হয় না। দুটোর একটা থাকে। লভটভ, যখন হ'ল না, তখন কার্ড-লাক নিশ্চয় আছে তোর।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হ'ল সুধীনকে। খেলতেও হলো সেদিন। আর আশ্চর্য্য, কি কারণে যেন সেদিন পরপর কয়েকটা দান জিতলো সুধীন। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। চলে এলো ও খেলা ছেড়ে, বিছানায় শুয়ে পড়লো।

কিন্তু।

একটা কথা ওর মনের চারপাশে ঘুরতে থাকে অবিরত। একটা না, দুটো কথা। কার্ড-লাক, লাভ-লাক্! প্রেমের খেলায় যে ব্যর্থ, তাসের খেলায় সে নাকি সৌভাগ্যবান। সত্যি নাকি কথাটা? তা না হ'লে...পরপর এতগুলো দান জিতলো কি করে ও! কে জানে!

ক্রমাগত ঐ একটা কথাই ওর মাথায় ঘুরতে থাকে। হাজার চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না।

এরপরও কয়েকবার খেলেছে ও, আর প্রতিবারেই জিতেছে। অতি অদ্ভুত ভাবে জিতেছে, আশাতীত ভাবে। প্রতিবারেই ঐ দুটো কথা দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ওর মাথার মধ্যে দুলেছে, টিক্ টিক্ করেছে। লাভ-লাক্, কার্ড-লাক্। ক্রমশঃ ওর কেমন ধারণা হয়ে গেছে তাসের খেলায় ওর ভাগ্যকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। ও জিতবেই। আর, আর তাস দেখলেই কেমন একটা নেশার স্পর্শ যেন ওর সমস্ত দেহে জড়িয়ে যায়। তাস! রং বেরঙের তাস ...টেক্কা সাহেব বিবি গোলাম...তাস...ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, চিড়িতন ...তাস দেখার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা নেশা যেন ওকে গ্রাস করে, সমস্ত সংজ্ঞা যেন হারিয়ে ফেলে ও। আত্মবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। জিতবো, জিতবোই আমি!

যখন সুস্থ থাকে তখন তাসকে ভয় পায় ও। ও জানে, অনুভবে বুঝতে পারে, তাসের খেলায় ও জয়ী হতে বাধ্য। কিন্তু, তারপর... তারপরও একটা পরাজয় আছে। ব্যর্থ প্রেম। ব্যর্থ প্রেমই ওর জয়ের কারণ নাকি? পমি...অনুপমা...অনুপমাকে মনে পড়ে যায়...যেন স্বপ্ন দেখে। রাত্রির বুকে চলন্ত ট্রেণের শব্দ যেন ওর বুকেও বেজে ওঠে। ধনঞ্জয়ের কথাটা মনে পড়ে যায়...অনুপমা হয়তো আত্মহত্যা করেছে ...চোখের সামনে ও যেন দেখতে পায়, ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়লো অনুপমা। পমি, পমি! ভয়ে, আশঙ্কায় চিৎকার করে ওঠে ও কোন কোনদিন। পমির রক্তাক্ত বীভৎস চেহারাটা যেন দেখতে পায় চোখের সামনে। সে অনুভূতি, সে দৃশ্য বড় অসহ্য। সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। পৃথিবী হারিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। নিজেকে

ভুলে যায়। সে সময় ও নাকি পাগলের মত কথা বলে, পাগলের মত অর্থহীন দৃষ্টি নামে ওর চোখে। ও শুনেছে, বহুবার শুনেছে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের কাছে, রাণুর কাছে। তাই তাসকে বড় ভয় করে ও। রক্তের উন্মাদনাকে অনুভবে বুঝতে পারে। আর তাস ওকে পমির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, অনুপমার কথা। সেই অবোধ্য বিস্ময়টা ফেনিয়ে ওঠে ওর মগজে। পমি, অনুপমা।

সেই অনুপমাকে দেখতে পেল এই এতবছর বাদে। পমি নয়, অনুপমা নয়। সিদ্ধিমাতা। কচি করমচার মত গোলাপী আভা সারা দেহে, হয়তো বা হিমালয়ের কোন তুষারশৃঙ্গে বহুকাল কাটিয়ে আসার ফলেই। চোখে বুদ্ধির জ্যোতি, হয়তো বা জীবন দিয়ে দর্শনকে উপলব্ধি করার ফলে। শরীর ঘিরে বাঘছালের অঙ্গাবরণ, কপালে গাং-মৃত্তিকার তিলক, চুলের অযত্ন কোমলতার লঘুভার লুটিয়ে আছে অনাবৃত পিঠের ওপর। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আর স্বস্তির দৃষ্টি।

সুধীনেরও কেমন একটা শ্রদ্ধা জাগলো দেখে চিনতে পারার পরেও। কাঠের চৌকিটার ওপর যৌগিক আসনে বসলেন সিদ্ধিমাতা। পারিষদ আর চেলাদের উদ্দেশে হাতের আঙুলে কি একটা বিচিত্র মুদ্রা সৃষ্টি করলেন। ইঙ্গিত বুঝে ঘরের বাইরে চলে এলো সকলে।

শুধু সুধীনের দিকে একবার তাকিয়েই সিদ্ধিমাতা বললেন, বসো। তারপর হাসলেন, ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ হাসি, কিশোরী মেয়ের নিলাজ অন্তরঙ্গতার হাসি যেন। অভিভূতের মত তাকিয়ে ছিল সুধীন, দুটি নম্র আর সহজ চোখের দিকে। ইশারাটা বুঝলো কি বুঝলো না, কথাটা শুনতে পেল কি পেল না, কে জানে। মোহগ্রস্তের

মত ধীরে ধীরে চৌকির এক কোণে, অনেকখানি দূরত্ব রেখে বসে পড়লো সুধীন। চোখ নামালো মাটির দিকে।

আরেক দমকা হেসে সিদ্ধিমাতা বললেন, আমি জানতাম।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চমকে চোখ তুললো সুধীন।

মৃদু হাসি মাখানো উত্তর এলো আবার, আমি জানতাম তুমি আসবে।

সুধীন তখনও কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

সিদ্ধিমাতা নিজের থেকেই বললেন, অনেক কিছু রহস্য থেকে গেছে তোমার কাছে, এই তো!

ঘামের বিন্দু উঠছে এদিকে সুধীনের কপালে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কথা খুঁজে পেল ও। হতাশা আর অভিযোগের সুরে বললে, সেদিন বলনি কেন?—সেদিন যদি বলতে! ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস চাপলো সুধীন।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—আজ যাও, কাল সকালে এসো বলবো সব।

সুধীন হঠাৎ ছেলেমানুষের মত হাত বাড়ালো সিদ্ধিমাতার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরতে। বললে, না অনুপমা, না। আজই না, আজই শুনতে চাই। শুনছো, অনুপমা, অনুপমা!

কোথায় অনুপমা। সিদ্ধিমাতার কানে বোধ হয় সে কথা পৌঁছলো না। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সেই যে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে চোখ বুজেছেন, সে চোখ আর খুললো না। মুখে কপালে পড়লো না একটাও রেখার কুঞ্চন। নির্ব্বিকার সমাধিস্থ ভাব।

পাপড়ি-চিকণ দুটি চোখের পাতার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সুধীন। অপেক্ষা করলো। কিন্তু কোন উত্তর পেলো না। চোখ খুললো না।

—অনুপমা। গাঢ় স্বরে ডাকলো সুধীন।

চোখের পাপড়ি তুলে মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিলেন সিদ্ধিমাতা। বললেন, পাগল!

সুধীন চুপ করে রইলো।

—এতদিন যদি ধৈর্য্য ধরে থাকতে পেরেছো, একটা দিন, একটা রাত অপেক্ষা করে থাকো।

—বলবে? সত্যি বলবে সব কথা? উৎসুক কণ্ঠে জিগ্যেস করলো সুধীন।

পাতলা গোলাপী ঠোঁটের পাশে মৃদু হাসি উঁকি দিলো আবার।

—বলবো, বলবো! আজ যাও, কাল ভোর বেলায় এসো তুমি। সব জানতে পারবে।

তবু চুপ করে বসে রইলো সুধীন!

—যাও! অনুরোধের সুর ফুটলো সিদ্ধিমাতার গলায়।

সুধীন ধীরে ধীরে উঠে এলো। একরাশ চিন্তা আর অধৈর্য্য আবেগ বুকে চেপে।

পরের দিন ভোর না হ'তেই এসে হাজির হ'লো সুধীন।

বিরাটবপু একটি দ্বারবান দাঁড়িয়ে ছিল সিদ্ধিমাতার ঘরের সামনে, সুধীন যেতেই পর্দার আড়াল থেকে সুধীনের নাম বললো সে। আর পর্দার ওপার থেকে ঢুকতে দেবার নির্দ্দেশ এলো।

ঘরে ঢুকেই সুধীন বিস্ময়ে হতবাক্। কোথায় বাঘছাল, কোথায় বা গঙ্গামাটির তিলক। দিব্যি একখানা খয়েরী রঙ্গের ডুরে শাড়ীতে ঢাকা সারা অঙ্গ, কালো ব্লাউজটা এঁটে আছে সুপুষ্ট হাতের ওপর।

—মিটি মিটি হাসির সঙ্গে প্রশ্ন ভেসে এলো, খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছো, না? কি করবো বলো, তোমার জন্যে আজ সিদ্ধিমাতাকে বিদেয় দিয়ে 'অনুপমা' সাজতে হ'ল।

সুধীন বিমর্ষ স্বরে বললে, তোমাকে যতবার দেখলাম কেবল আশ্চর্য্যই হ'লাম। বুঝতে কোনদিনই পারলাম না।

—সত্যি?

সুধীন হেসে বললে, সত্যিই। প্রথম আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসি এ কথা জানার পর কি করে তুমি আমাকে ভালবাসলে।

—প্রেম কোন আইন মানে নাকি? সকলেই বারবার প্রেমে পড়ে, কিন্তু সব প্রেমই নতুন।

সুধীন বললে, হয়তো তাই। কিন্তু ট্রেণ থেকে তোমার হঠাৎ উধাও হওয়াটা?

—হ্যাঁ, ঐ ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত, আমিও মানছি। নিজের ব্যবহারে আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু সব ইতিহাসটুকু শুনলে—তোমার সন্দেহ ঘুচবে হয়তো।

—ইতিহাস না হোক, মনে মনে যে গল্পটা বানিয়ে রেখেছো সেটুকু শুনে অন্ততঃ কিছুটা সান্ত্বনা পাবো।

—বেশ তাই শোনো। অনুপমা বললে। তারপর শুরু করলে ওর কাহিনী।

হাসতে হাসতে বললে, ধনঞ্জয়দাকে মনে আছে তো? ওর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ছিল অনেক দূর সম্পর্কের। কিন্তু ওদের আর আমাদের পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল খুব বেশি, তাই ঘনিষ্ঠতাও ছিল। ছোটবেলা থেকেই ওকে রাঙাদা বলতাম আমি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রাঙাদা খুব ভালবাসতো আমাকে। প্রায়ই বেণী ধরে টানতো, চিমটি কাটতো, কথায় কথায় রাগাতো। তারপর, তারপর যখন বড় হলাম···কথার মাঝখানেই হেসে উঠলো অনুপমা···কোনরকমে হাসি চেপে বললে, যখন বড়ো হলাম তখন বুঝতে পারলাম মহাপুরুষটি আমাকে ঠিক স্নেহ করেন না, ভালবাসেন।

আবার হেসে উঠলো অনুপমা। বললে, এখন হাসছি বটে, তখন কিন্তু রীতিমত ভয় হ'ত। এমন ভাবে তাকাতো, বুক অবধি ছ্যাঁৎ করে উঠতো। তাই আপ্রাণ চেষ্টা করতাম ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে! কিন্তু তাতেই কি রেহাই পেতাম! একেবারে সরল মানুষটি সেজে পাশে এসে বসতো, কাঁধে হাত রাখতো···আর কি সাহস বাপু, সকলের সামনেই এমন ভাবে কথাবার্ত্তা বলতো যেন ছোট্ট খোকাটি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না।

সুধীন হেসে বললে, আপত্তি করতে না?

অনুপমা হেসে উঠলো।...ব্যাপার কি জানো, একেবারে যে খারাপ লাগতো তা নয়। তবে সীমা অতিক্রম করলেই রাগ হতো!

—তাই বলো। মানে, দুর্ব্বলতাও ছিল তোমার।

অনুপমা বললে, না, দুর্ব্বলতা আমার ছিল না। তবে আমার ওপর আরেকজনের দুর্ব্বলতা আছে এটা দেখতে বেশ মজা লাগতো। তারপর তো তোমার সঙ্গে সেই সিনেমা হল থেকে বেরোবার সময় ধরা পড়লাম। মনে আছে?

সুধীন বললে, আর ধনঞ্জয় এসেই বলে দিলো বাড়ীতে, এই তো?

অনুপমা আবার হেসে উঠলো। বললে, আমি তো তাই আশঙ্কা করেছিলাম। উঃ সেদিন যা ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম। পা টিপে টিপে একেবারে সটান ছাদের ঘরে। ঝি'কে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম, রাঙাদা এসেছিল কিনা। ও বললে, আসে নি। তবু কি ভয় যায়, কেবলই মনে হয় এই বুঝি এলো। এলোও। পরের দিন। দরজার আড়াল থেকে কান পেতে শুনলাম কিছু বলে কি না মাকে।

—মাকে ভয় পেতে খুব, না?

—একটুও না, বলে দিলে কি আর মারধোর করতো নাকি। তা নয়, তোমার সঙ্গে আর দেখা করতেই দেবেনা, এই ভয়।

—তারপর?

—তারপর, রাঙাদা একসময় আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, 'কিছু বলবো না, ভয় নেই তোর'। আর আশ্চর্য্য, রাঙাদা 'ভয় নেই' বলতেই ভয় বেড়ে গেল আমার। তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করলাম, যাতে রাঙাদা বলে দিলেও কেউ বিশ্বাস না করে। তাই কলেজও ছাড়লাম, অসুখের নাম করে।

এতক্ষণ হাসতে হাসতে কথা বলছিল অনুপমা, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, ভুল করেছিলাম। হঠাৎ দুপুর বেলায় একদিন ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি রাঙাদা। লজ্জায় মাথা নীচু করলো অনুপমা। কথা আটকে গেল ওর, রাগে না ঘৃণায় বোঝা গেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তখন আর উপায় নেই।

সুধীনও দীর্ঘশ্বাস ফেললো।—অন্যায়ের বিরুদ্ধেও সাহস জোটে না তোমাদের !

—অনিচ্ছার কলঙ্ককেও গোপন রাখতে বাধ্য করো যে তোমরা, পুরুষরা। সত্যি কথাটা যদি স্পষ্ট করে সেদিন বলতাম, তা হ'লে তুমিও ক্ষমা করতে না।

—কি জানি।

অনুপমা বললে, যাক্‌গে সে কথা। কিন্তু দেখলাম, প্রথম দিনের কলঙ্ক লুকোতে গিয়ে তার কাছে যেন নিজেকে বিক্রী করে ফেলেছি। সাহস যখন জুটলো, তখন নিজেই নিজের মুখ বন্ধ করে ফেলেছি। প্রথম প্রথম খুব রাগ হতো বটে, কিন্তু ক্রমশঃ যেন সয়ে গেল। তারপর কপাল পুড়লো একসময়। এদিকে রাঙাদাও উধাও হ'ল হঠাৎ। একমাত্র তুমিই তখন ভরসা। বয়সে বছর কয়েকের বড়ো হলেও ফুলমাসীমা ছিলেন আমার একরকম বন্ধু, সাথী। তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার খবরটুকু ফুলমাসীমা জানতো। কিন্তু কলেজ ছেড়ে দিয়েছি তখন, তাই বাড়ীর বাইরে যেতে পারতাম না। গিয়ে কেঁদে পড়লাম তার কাছে, সাহায্য চাইলাম। তারপর তো তুমিই জানো।

সুধীন তন্ময় হয়ে শুনছিল। চোখ তুলতে পারলো না ও, নিজের পায়ের দিকে চোখ রেখে বললে, প্রতারণা করতে চেয়েছিলে আমার সঙ্গে। কিন্তু, কিন্তু অনুপমা তুমি তো সব খুলে বলতে পারতে আমাকে। গলার স্বর ভারী হয়ে এলো সুধীনের।

অনুপমা হাসলো।—তোমার সঙ্গে মেলামেশা করার কথা মাকে বলতে পারি নি, আর অতবড়ো একটা কলঙ্কের কথা তোমাকে বলবো? তোমাকে হারাবার ভয়েই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সুধীন বললে, কিন্তু আমাকে কিছু না জানিয়ে, ট্রেণ থেকে নেমে গেলে কেন?

উত্তর এলো, কখনো কখনো মানুষ হয়ে উঠি বলেই।

—বুঝলাম না ঠিক।

—বুঝবেও না। মানুষের মনটা এতই সূক্ষ্ম জিনিষ যে কেউই তার নাগাল পায় না। ফুলমাসীমার হাতে চিঠি দিয়ে যখন পাঠালাম তোমার কাছে, আমার আশঙ্কা হয়েছিল তুমি হয়তো রাজি হবে না। কিংবা রাজি হলেও সেই রাত্রেই চলে যেতে চাইবে না। দু' একটা ওজর আপত্তি দেখাবে। অথচ চিঠি পড়েই তুমি নেমে এলে। প্রথম ধাক্কা খেলাম আমি তখনই। তারপর, তারপর ট্রেণে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি, তোমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম—কি প্রশান্তি কি বিশ্বাসের চিহ্ন দেখেছিলাম সেদিন তোমার ঘুমন্ত মুখে—ভাবলাম, এতখানি গভীর বিশ্বাস আর ভালবাসার কি দাম দিচ্ছি আমি? ট্রেণের জানালায় মাথা রেখে কত কি ভাবছিলাম। চুলগুলো উড়ছিলো হাওয়ায়। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছিল চোখে কপালে, তবু মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো। সারা শরীর জ্বালা করছিল আমার, হাত পা কাঁপছিল। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এলো। এমন সময় টাটানগর ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামলো। আত্মহত্যাই বলতে পারো, ভাবলাম, নিজের কপালে যা ঘটবার ঘটুক। তোমাকে আর আমার অভিশপ্ত জীবনের ভাগ দেবো না। নেমে পড়লাম।

—তারপর ?

অনুপমা হাসলো।—তোমার জীবনের রহস্যটুকু দূর করবার জন্যেই এত কথা বললাম। আমার জীবনের কথা জিগ্যেস করো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপমা বললে, এবার যাও, বেলা বাড়ছে। সিদ্ধিমাতা হতে হবে আবার আমাকে।

সুধীন হেসে বললে, তোমার এ ইতিহাস জানলে তোমার খ্যাতিতে কলঙ্ক পড়বে না! তোমার ধর্ম নিয়ে অভিনয় ধরা পড়ে যাবে হয়তো।

অনুপমা হঠাৎ ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো সুধীনের দিকে। ধীরে ধীরে বললে, হাসতে হাসতে যে কথাগুলো আমরা বলি তার মধ্যেও গভীর সত্য লুকিয়ে থাকে, এটুকু জেনে রাখো। আর, আর পিছনের ইতিহাস দিয়ে সামনের মানুষকে যে বিচার করে সে নিজেই ঠকে, এটুকুও জেনে রাখো।

সুধীন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

অনুপমা একবার চোখ তুললো, চোখ নামালো। কি যেন একটা প্রশ্ন চমক দিলো ওর চোখের তারায়। সুধীন বেশ বুঝতে পারলো কিছু একটা জিগ্যেস করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে অনুপমা। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে যেন।

সুধীন অপেক্ষা করলো।

কিন্তু না, কি একটা কথা যেন ভাষা খুঁজছে। কি যেন প্রশ্ন হয়ে শুধু অনুপমার চোখেই ভাসলো, ভাষা পেলো না।

চোখ তুলে তাকালো আবার অনুপমা।

চোখে-চোখি হ'ল। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলো অনুপমা।

তারপর একসময় ফিসফিস করেই যেন বললো শান্ত গলায়। —ফুলমাসীমার সঙ্গে দেখা হয় ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুধীন ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

—আর, আর ধনঞ্জয়দা'? কোথায় আছে, কেমন আছে, জানো তুমি?

সুধীন বিস্মিত হয়ে তাকালো ওর মুখের দিকে।

বললে, জানো না, জানো না তুমি?

—না তো! কেমন যেন ভয়ার্ত কান্নার স্বর ফুটে উঠলো অনুপমার কথায়, কি হয়েছে ধনঞ্জয়দা'র, কোথায় সে?

মাথা নীচু করলো সুধীন। চোখের পাতাও ভিজে এলো বোধ হয়।

একটাই দিন। তবু সুধীনের মনে হ'ল কত কি যেন ঘটে গেল। রহস্যের ঝড় উড়ে গেল, ঝরে পড়লো ধুলো পাতার রাশি।

চিন্তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে যখন বাসার পথ ধরলো সুধীন তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারের গায়ে দু'চার খি পাকা চুলের মত আলোর ক্ষীণ রেখা।

ট্রাম থেকে নেমে পার্কের পাশ দিয়ে অন্ধকার গলিতে ঢুকেই কেমন যেন নিশ্চিন্ত মনে হ'ল নিজেকে। রাত সাবালক হওয়ার আগেই গলিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মোড়ের বস্তিতে যে বুড়িটা দেয়ালের ঘুঁটে ছাড়াতে ছাড়াতে স্বগতস্বরে গালাগালি পাড়ে, আর রোজ সকালে যে এক ঝুড়ি গোবর নিয়ে সারা দেয়ালে ঘুঁটে ঠাসতে ঠাসতে জোয়ান ছেলের হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে মরে যাওয়ার কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে করে বলে যায়, অন্যদিন এমন কমবয়েসী রাতে সে হুঁকোয় ঠোঁট ছুঁইয়ে গল্প বলে, আর বাচ্চা নাতি নাত্নীগুলো বুড়ির জিলজিলে মুখটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে শোনে সেই সব গল্প। বাসায় ফেরার পথে এ দৃশ্য বহুদিন দেখেছে সুধীন।

কিন্তু আজ কেমন যেন আতঙ্কে-চুপ-চুপ নিঃশব্দ রাস্তা। বস্তীর ঘরগুলোয় আলো তো নেইই, শব্দও নেই। পাশের রঙিন পর্দ্দার দোতলার রেডিওটাও থেমে গেছে। প্রশ্নচিহ্নের মত আঁকা-বাঁকা গলিটায় সত্যিই যেন কি একটা জিজ্ঞাসা দুলছে। আর দূরে দূরে গ্যাস-পোষ্টগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদারের মত, মাথায় আলোর

পাগড়ী বেঁধে।

একটা গ্যাসবাতির নীচে শুধু ডাষ্টবিনের পাতা ঘাঁটছে গোটাকয়েক কুকুর।

ধীরে ধীরে হাঁটছিলো সুধীন। কত কি কথা, কত কি নতুন খবর আর পুরোনো চিন্তা যেন মাথার মধ্যে জমে রয়েছে। রাণুর কাছে সব স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে না পারলে যেন অস্বস্তি কাটবে না।

কিন্তু খানিকটা এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সুধীন। ঠিক্ বাসার সামনেই দেখলো জন কয়েক কনেষ্টবল, দরজার সামনেই।

অনেক কষ্টে ঢুকতে পেলো সুধীন, আর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, জনকয়েক কনেষ্টবল আর একজন দারোগা ভগীরথের ঘরের জিনিষপত্তর তছনছ করছে। কি কারণ তা ঠিক্ বুঝতে পারলো না।

দোতলায় উঠে আসতেই রাণু আর নীলা দু'জনেই ছুটে এলো একসঙ্গে। ঠোঁটের ওপর আঙুলের চাবি এঁটে ইশারায় চুপ করতে বললো রাণু।

ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বললে, শুনেছো?

—না তো? কি হয়েছে কি? উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো সুধীন।

নীলা চোখ গোলগোল করে গালে হাত দিয়ে তাকালো।

আর রাণু কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, মাতালটা নাকি খুন করেছে।

—খুন করেছে! কাকে! বৌটাকে?

—না। চাপা গলার স্বরে আরো বিস্ময় ফুটে উঠলো যেন। রাণু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, না অন্য কাকে খুন করেছে। এখানে নয়।

—ধরা পড়েছে?

রাণু বিস্ময়ের চোখে একবার নীচের দিকে উঁকি দিলো কপাটের আড়াল থেকে, তারপর বললো, কি জানি। বাড়ীতে ছিল না।

নীলা বললে, আমরা তো জানতামই না। দারোগা বললো বাবাকে।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো রাণু। আর সুধীন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধপ করে বসে পড়লো বিছানার ওপর। জিগ্যেস করলো, বৌটা? বৌটা কোথায়?

নীলা বললে, আহা, বেচারী বৌটা শুধু কাঁদছে বসে বসে।

রাণুও চোখে মুখে ব্যথা আঁকলো। কিন্তু তার বেশি খবর ওরা কেউই দিতে পারলো না।

হঠাৎ সন্ধ্যের সময় নাকি পুলিস এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। আর জনকয়েক ঢোকে বাড়ীর ভেতর। তারপর দারোগাটা এসে ডেকে নিয়ে যায় সুধীনের বাবা—মহাদেববাবুকে। রাস্তার ওপাশের বাড়ীর ডাক্তারবাবুকেও কে যেন ডেকে আনে। এইটুকুই শুধু দেখেছে ওরা, আর দারোগার ফিসফিস কথাও শুনেছে মহাদেববাবুর সঙ্গে। কোথায় কাকে যেন খুন করেছে ভগীরথ! ব্যস, আর কিছু জানতে পারেনি রাণু।

ঘণ্টাখানেক পরেই পুলিশের দল চলে গেল। তল্লাসীর পরোয়ানায় স্বাক্ষীর সই দিয়ে ফিরে এলেন মহাদেববাবু। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও সব খবর জানা গেল না।

নিরুত্তর প্রশ্নগুলোর খবর মিললো পরের দিনের খবরের কাগজে। রীতিমত রোমহর্ষক ঘটনা, যা শুধু খবরের কাগজেই শোভা পায়, আর যা খবরের কাগজে না দেখলে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না।

একটি অভিজাত বংশের মেয়ের সঙ্গে নাকি ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল ভগীরথের। ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম। এবং তারপর সেই সন্তান-সম্ভবা

মেয়েটির কলঙ্ক দূর করার সহজ পথ নিতে গিয়ে, কিংবা কে জানে, হয়তো দায়িত্ব মুছে ফেলার জন্যে খুনের দায়ে ধরা পড়েছে ভগীরথ।

পুলিশের কাছে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকারোক্তিও করেছে সে, শোনা গেল।

কিন্তু কান্নায় ফুলে ওঠা লাল চোখ নিয়ে মিষ্টি ছিমছাম চেহারার বৌটি এসে দাঁড়ালো সুধীনের সামনে, ঘোমটার আড়ালে তার চোখ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও রাণু বুঝতে পারলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটি।

পিঠে হাত দিয়ে কাছে বসালো তাকে রাণু। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে সশব্দে কেঁদে উঠলো সে।

ফোঁপানির স্বরে বললে, ও কক্ষনো একাজ করেনি, কক্ষনো না।

—তবে ভাবছো কেন ভাই, উনি ঠিক্ ছাড়া পাবেন, দেখো। মিথ্যে জেনেও আশ্বাস দিতে চাইলো রাণু।

আর সঙ্গে সঙ্গে বৌটির কান্না থামলো যেন। চোখ তুলে আশায় আশায় তাকালো সে। বললে, পাবে, ছাড়া পাবে?

সুধীন বললে, হ্যাঁ। ভাববেন না আপনি, ঠিক্ ছাড়া পাবেন। খুনী প্রমাণ করা কি সহজ নাকি?

হঠাৎ মাথা ঝাঁকা দিয়ে বৌটি বলে উঠলো, না, না। বিশ্বাস করুন ও কখনো এ-কাজ করে নি। আমার মন বলছে ও এ-কাজ করতে পারে না। কখনো না। ভুল করে ওকে ধরেছে ওরা, আমার মন বলছে ও কিছুতেই এ-কাজ করতে পারে না।

সুধীন আর রাণু দু'জনেই চুপ করে রইলো।

বৌটি হঠাৎ আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। —ও কখনোই স্বীকার করে নি, জোর করে স্বীকার করিয়েছে ওরা। আমার যে কেউ নেই, কেউ নেই আমার, আপনারা বাঁচান ওকে।

সুধীন বললে, কেউ নেই আপনার? আত্মীয়স্বজন? মামলার

ব্যবস্থা তো করতে হবে, নিজের লোক না থাকলে…

রাণুও কেঁদে ফেললো এবার। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললে, কে থাকবে বলো ?

—কেন ? বিস্ময়ের প্রশ্নে তাকালো সুধীন।

রাণু বিষণ্ণ হাসি হাসলো। আর বৌটি লজ্জায় মাথা নীচু করলো।

সুধীন বুঝতে পারলো এতক্ষণে। প্রেমের ইশারায় সাড়া দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসেছিল বৌটি। তাই বাপ মা ভাই বোন সব ভুলতে হয়েছে। হয়তো ফিরে গেলেও কোন সাহায্য পাবে না তাদের কাছ থেকে।

বৌটি খানিক চুপ করে থেকে বললে, নিজের কপাল নিজেই যে পুড়িয়ে এসেছি, কি করে তাদের কাছে যাবো বলুন ! আপনি ওকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে দিন।

—ব্যবস্থা করবো আমি, নিশ্চয়ই করবো।

—করবেন ? সত্যি করবেন আপনি ব্যবস্থা ? আশার আনন্দে চোখ তুলে তাকালো বৌটি।

সুধীন উত্তর দিলো, পড়শির বিপদের সময় পড়শি না দেখলে কে দেখবে বলুন ?

বৌটি যেন হাসলো একমুহূর্ত্তের জন্যে। বললে, বিশ্বাস করুন, ও কখনো এ কাজ করতে পারে না। বিশ্বাস করুন আপনি।

আদালতে মামলা ওঠার দিনকয়েক আগে রাণু বললে, আমারও বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না। লোকটা যত খারাপই হোক্ ও খুন করেছে মনে হয় না।

সুধীন হেসে বললে, পুলিশের কাছে প্রথমে স্বীকার করেছিলো কেন তা হলে? উকীলের পরামর্শে এখন নয় বলছে, ও কিছুই জানে না।

রাণু বললে, যাই বলো, আমার কিন্তু বৌটার কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যি লোকটা ভালোই। খুনোখুনীর ব্যাপারে ও থাকতে পারে না।

সুধীন গম্ভীর হয়ে বললে, মনে হওয়াটাই সব নয় রাণু। ধনঞ্জয়কে দেখেও কোনদিন ভাবতে পারি নি···

রাণু চুপ করে গেল। ধনঞ্জয়ের কথা উঠলেই ও চুপ করে যায়।

সুধীন তবু বললে, জানো রাণু, ধনঞ্জয়ের কথাটা মনে পড়ে কয়েকদিন ধরেই মনটা খারাপ হয়ে আছে।

রাণু বিরক্তির স্বরে বললে, কেন ওর কথা বারবার বলো তুমি!

—কেন? কেন তা বলি নি তোমাকে। অনুপমাকে মনে আছে তোমার? অনেক বার তো বলেছি তোমাকে।

—হ্যাঁ। মনে আছে। কি হয়েছে তার?

—সিদ্ধিমাতা হয়ে ফিরে এসেছে সে।

—ওমা রাণু বিস্মিত হয়ে বললে, সত্যি?

—হ্যাঁ, চলো তোমাকেও নিয়ে যাবো একদিন।

রাণু হেসে ফেললো। বললে, সত্যি নিয়ে যাবে? তোমার সিদ্ধিমা চটে যাবেন না তো আমাকে দেখে?

সুধীন কিন্তু ওর হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। বললে, অনুপমাও জিগ্যেস করছিলো ধনঞ্জয়ের কথা।

—বললে তাকে?

সুধীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, না শুনলে হয়তো কষ্ট পাবে মিছিমিছি।

—কেন? বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলো রাণু।

সুধীন বিষন্ন হাসি হাসলো। সত্যিই তো। কি করে বুঝবে রাণু। কি করেই বা জানবে ও কি রহস্য এতদিন লুকিয়েছিল ওর জীবনের আড়ালে! একটি বিস্ময়ের চাবি পেয়েছে ও নিজের জীবনের, আর সেই চাবিতেই খুলেছে ও ধনঞ্জয়ের রহস্যময় জীবনের কুলুপ।

ধীরে ধীরে সুধীন বলে গেল সব কথা, সব রহস্যের গোপন তথ্য জানালো রাণুকে। যা কিছু শুনেছে ও অনুপমার কাছে।

সেই যে ট্রেণে যেতে যেতে মাঝপথে অনুপমাকে হারিয়ে ফিরে এসেছিল সুধীন তারপর থেকেই সুধীন আর ধনঞ্জয় দু'জনেই যেন মানুষ বদলে গেল।

অনুপমার অন্তর্ধানের কারণটা হয়তো ফুলমাসীমা চেপে রেখেছিল। মাঝে মাঝে অনুপমার বেঠিকানা চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও। তাই ধনঞ্জয়ের মনে দুলতো নানান বিস্ময়, নিজেকে অপরাধী মনে করে অসহ্য আত্মদহনে পুড়তো ও ভেতরে ভেতরে। অথচ স্পষ্ট করে প্রকাশ করতেও পারতো না সব কথা।

শুধু মাঝে মাঝে হতাশার ভঙ্গিতে বলে উঠতো, জানিস সুধীন, আমার মনে হয় অনুপমা আত্মহত্যা করেছে। আর সে জন্যে দায়ী একমাত্র আমি!

সুধীনের মনেও দুলতো এমনি এক দ্বন্দ্ব। ভাবতো, অথচ ভেবে ভেবেও কোন কূলকিনারা পেত না। আকস্মিক ইশারায় ডাক দিয়ে নতুন জীবনের জন্যে যে যাত্রা করলো, হঠাৎ কোন কিছু না জানিয়ে ট্রেণ থেকে সে নেমে গেল কেন? তখনও এ প্রশ্নের উত্তর পায়নি সুধীন।

তাই ব্যথায় চুপ করে থাকতো ও। নিজেকে কেবলই মনে হ'ত প্রবঞ্চিত। যেখানে জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে অনুপমা হঠাৎ কেন এমন প্রতারণা করলো বুঝতে পারতো না সুধীন।

তাই দু'জনের জীবন থেকেই যেন সব আনন্দ উবে গেল।

সুধীন আর ধনঞ্জয়—যারা ফুর্তিতে আনন্দে হৈ হৈ করে বেড়াতো,

পরস্পর পরস্পরের কাছে খুলে ধরতো গোপন মন, তাদের মধ্যে হঠাৎ নেমে এলো নির্ব্বাক স্তব্ধতার দেয়াল।

মুখোমুখি বসতো ওরা দুজনেই। অথচ দু'জনেই চেষ্টা করতে নিজের মনের দ্বন্দ্ব লুকিয়ে রাখতে।

এরই ফাঁকে এক একসময় ধনঞ্জয়ের দীর্ঘশ্বাস শোনা যেত। কখনো বা অস্ফুট কান্নার স্বরে যেন উচ্চারণ করতো সে অনুপমার নাম।

বন্ধুবান্ধবরা বুঝতো না, বুঝতে পারতো না দু'জনের মনের ঝড়। তারা কখনো-সখনো এসে বসতো, আড্ডা দিতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু আগের মত ওরা যেন যোগ দিতে পারতো না। তাসের আড্ডায় টেনে নিয়ে যেতো দু'জনকেই। কিন্তু তাস হাতে নিয়েও উন্মনা হয়ে যেত ধনঞ্জয়।

তারপর ক্রমশ আসা যাওয়াও কমে গেল। তিনদিকে কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট ঘরটিতে বসে থাকতো ধনঞ্জয়, একা একা। কারো সঙ্গে কথা বলাতা না, মিশতো না, থাকতো চুপচাপ।

সুধীন দু'একদিন গিয়েছে ওর ঘরে, কিন্তু কোন সাড়া পায় নি। চুপচাপ বসে বসেই হয়তো বইএর পাতা উল্টেছে ধনঞ্জয়। হয়তো বা উদাস দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থেকেছে সামনের জন-চঞ্চল রাস্তাটার দিকে। অস্বস্তি বোধ করেছে সুধীন, ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে ওর আর ধনঞ্জয়ের মধ্যে ছিল যে নিবিড় বন্ধন তা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে। ঝর্ণার শব্দতরঙ্গ চিরদিন পাহাড়ের গায়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে এসে হঠাৎ দেখলো পাহাড় নির্ব্বিকার হয়ে গেছে। অভিমানে তাই নিজের বেদনা যেন নিজের কাছেই উপহাসের মত শোনাতো। শুনতো শুধু, হঠাৎ কখনো, ধনঞ্জয়ের দীর্ঘশ্বাস।

কার্ড-লাক্, লাভ-লাক্।

প্রেমের জীবনে যে বিড়ম্বিত, তাসের খেলায় তার জিৎ নাকি অবধারিত।

আশ্চর্য্য !

হাল্কা হাসির এই রসিকতাটুকু চরম সত্য মনে হ'লো সুধীনের। মনে মনে সত্যিই ও বিশ্বাস করে বসলো, সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছে ও। তাস ওর সুভগ গ্রহ যেন। প্রেমে ব্যর্থ হ'লেও আরেক দিকে ও জয়ী হতে বাধ্য।

সত্যি সত্যিই পরপর কয়েকদিন খেলতে গিয়ে অভাবনীয় ভাবে জিতে গেল ও। আর কেবলই ওর মাথার মধ্যে ঘুরতে সুরু করলো ছটি কথা! কার্ড-লাক্, লাভ-লাক্।

আর এই বিশ্বাসই ক্রমশ ওকে টেনে নিয়ে গেল তাসের আড্ডায়। জুয়ার আড্ডায়। শুধু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই নয়, চৌরঙ্গীর একটি অন্ধগলির নিশীথ ক্লাবেও হানা দিতে সুরু করলো ও। টাকার নেশায় সব ভুলে গেল।

এমনি ভাবেই কাটছিল ওর দিনগুলো। সেদিনও এমনি এক নিশীথ ক্লাবে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটিয়ে ফিরে এলো ও।

হোষ্টেলের বাড়ীটা তখন নিঃঝুম, নিশ্চুপ। বাসিন্দেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। আলো নিভে গেছে প্রত্যেকটি ঘরে, করিডরে রাস্তার দিকের বারান্দায়।

পা টিপে টিপে ঢুকলো সুধীন। ঘরের দরজা খুলে গিয়ে বসলো বিছানার ওপর। উগ্র মদের নেশায় যেন সমস্ত শরীর ওর ঝিমঝিম করছে। জুয়ায় জেতা নোটের তাড়াটা স্পর্শ করলো একবার, পকেটে হাত দিয়ে। শিরা উপশিরায় রক্তের উষ্ণতাই নয়, উন্মত্ত অবোধ্য এক চাঞ্চল্য অনুভব করলো।

বিছানায় শুয়ে পড়লো সুধীন। কিন্তু ঘুম এলো না কিছুতেই।

আন্ধকার কড়িকাঠের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ। দূরের কোন একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজার শব্দ ভেসে এলো এক-সময়। তখনও ঘুম নামে নি সুধীনের চোখে।

হঠাৎ একসময় উঠে পড়লো সুধীন বিছানা ছেড়ে। এগারোটার সময়ে সমস্ত হোষ্টেলের আলোর মেন স্বুইচ নিভিয়ে দেয়া হয়। তাই আন্দাজে আন্দাজে কুঁজোটার কাছে এগিয়ে গেল। মাথায় খানিকটা ঠাণ্ডা জল দিলে হয়তো ঘুম আসবে।

কিন্তু কুঁজোতে জল নেই এক ফোঁটা।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো সুধীন। কলঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।

দেখলো কলঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সুধীন। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেলো না। কলঘরেব ভেতরটাও অন্ধকার।

ধীরে ধীরে দরজায় টোকা দিয়ে সুধীন জিগ্যেস করলো, ভেতরে কে?

কোন উত্তর এলো না।

তখন স্পাইরেল সিঁড়িটার দিকে কলঘরের জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল সুধীন। কাচের জানালাটার সামনে ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ধরলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো ও।

মাচন্দার গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় আসার আসল উদ্দেশ্যটা কিন্তু ভুলে যায় নি রাণু। নীচের তলায় কচি-মুখ বৌটার গুমরে ওঠা কান্না ভেসে এসেছে থেকে থেকে, ইন্দিরার কাছ থেকে তাদের বাড়ীতে একদিন পদধূলি দেয়ার জন্যে পোষ্টকার্ডের নিমন্ত্রণ এসেছে কখনো সখনো, সিদ্ধিমাতার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে ঝিমঝিমে চিন্তাক্রান্ত মাথায় ফিরে এসে চুপচাপ বসে থেকেছে সুধীন একটিও কথা না বলে, বৃদ্ধ শ্বশুর মহাদেবরাবু প্রতিদিন দশটা পাঁচটা করেছেন, নীলার আব্দার রক্ষার জন্যে রাণুকে কখনো সিনেমায় যেতে হয়েছে কখনো বা দোকানে দোকানে, পথে পার্কে, আর এরই ফাঁকে রাণু বারবার মনে পড়িয়ে দিয়েছে শ্বশুরকে, সুধীনকে।

বলেছে, জমিজমা গরুবাছুর ফেলে কতদিন এইখানে পড়ে থাকবো বাবা? আপনার ছেলেকে বলুন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। আমি বললে তো কথা কানে তোলে না।

মহাদেববাবু সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, ঝামেলাটা মিটুক একটু, ব্যবস্থা করবো বৈকী বৌমা। এমন কিছু ভয়ের তো নয় যে আজ না করলেই নয়। থাক্ না দুটো দিন।

রাণু অনুযোগ করেছে, দুটো দিন দুটো দিন করতে করতে তো অনেকগুলো দিনই কেটে গেল। আবার তো ফিরতে হবে গাঁয়ে।

আসলে তা নয়। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাতে পারলে যেন বাঁচে ও। দেখছে, ক্রমশই যেন জড়িয়ে পড়ছে ও কোলকাতার

মানুষদের সঙ্গে। কিন্তু আসল ভয়টা স্বীকার না করলেও অনুভবে বুঝতে পারে মাঝে মাঝে। সুধীনের এই প্রতিদিন সিদ্ধিমাতার কাছে সময় কাটানো আর ফিরে এসে পুরোনো দিনের অনুপমার গল্প, হাসতে হাসতেই বলে বটে সুধীন, কিন্তু রাণু টের পায় ঐ হাসির আড়ালে যেন এক ফোঁটা ব্যথার অশ্রু চকচক করে ওঠে।

তাই একরকম জোর করেই ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করলো ও। সুধীনেরই এক সহপাঠী, কোন একটা উন্মাদ আশ্রমের নামকরা চিকিৎসক, পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করলো।

আর সেই সূত্রেই ডাক্তার সেনের ছোট ভাই সুরজিৎ সেদিন এসে হাজির হ'ল ভোর সকালে।

সুধীন তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে নিমকাঠির বদলে টুথব্রাশ ঘষছে দাঁতে। আর রাণু ইতিমধ্যেই ষ্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করে ফেলেছে।

সুরজিৎকে দেখে রাণু বললো, এসো ঠাকুরপো, এখানে এসে বসো। তোমার জন্যেই চায়ে পাতা ভেজাই নি এতক্ষণ। বলে ঠোঁট টিপে হাসলো রাণু।

বারান্দার পাশে পেয়ালা পীরিচ, চা চিনির টিন, দুধের বাটি আর গরম কেৎলী নিয়ে পা গুটিয়ে বসেছিল রাণু, পাশের জায়গাটায় একখানা আসন পেতে দিলো সুরজিৎকে বসবার জন্যে।

আসনটা সরিয়ে দিয়ে সুরজিৎ সিমেণ্টের মেঝেতেই বসে পড়ে বললে, ভালো সময়েই এসেছি বলুন ?

—তা ভালো সময় বৈকী। ঘুম থেকে উঠেই তোমার মুখ দেখলাম দিনটা বোধহয় আজ ভালই যাবে, কি বলো ?

সুরজিৎ হাসলো। বললে, এমন বাড়ীতেই থাকেন, আজ খুন,

কাল বৌ ঠ্যাঙানো···এসব তো লেগে আছে শুনি। ইদ্দিন আর ভালো যাবে কি করে ?

রাণু হেসে বললে, তা যা বলেছো ভাই। নীচে তলার কাণ্ড শুনেছো তো ?

—শুনেছি। দাদাই বলছিলো। তাইতো এলাম সুধীনদা দুপুরে কোর্টে যাবেন মামলা তদারক করতে, না দাদার সঙ্গে ডাক্তার আস্ত্রোঁর কাছে যাবেন জিগ্যেস করতে।

রাণু বললে, তাই বলো, আমি ভাবলাম ঠাকুরপোর বুঝি বৌঠাকরুণকে মনে পড়েছে হঠাৎ। কিন্তু, মামলার তো দিন পাল্টে নেয়া হয়েছে, আসছে সোমবার। তোমার দাদার কাছেই যাবে বলে দিও। বলে চায়ের পেয়ালাটা সুরজিতের দিকে এগিয়ে দিলো রাণু। আর আরেক পেয়ালা চা নিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই সুধীন মুখ হাত ধুয়ে এসে বসলো সেখানেই।

সুরজিৎ বললে, অমন খুনী লোককে আবার ডিফেণ্ড করছনে কেন ? ও ব্যাটার ফাঁসী হওয়াই ভালো।

বছর বাইশ তেইশের স্বাস্থ্যবান চেহারার তুলনায় সুরজিতের মুখটা যেন একটু সরল, মনটাও সম্ভবত। তাই কথাটা একটু রাগত স্বরেই বললো ও।

সুধীন হেসে বললে, কি ব্যাপার হঠাৎ এত চটছো কেন ?

সুরজিতের হয়ে রাণুই উত্তর দিলো। বললে, মানুষ মাত্রেই চটবে। ওতো এখনো বিয়ে করে তোমাদের মত অমানুষ হয়নি। কি বলো ঠাকুরপো ?

সুধীন হাসলো।—ভুল করলেই কি অমানুষ হয় ?

—ভুল ? বাড়ীতে বৌ থাকতে অন্য মেয়ের পেছনে ছোটে সে

আবার মানুষ। আর তাও নয় ক্ষমা করা যায়, তা বলে বিপদ দেখে মেয়েটাকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে যায় সে আবার মানুষ। তবে হ্যাঁ, বলতে পারো সব পুরুষ মানুষই ঐ রকম।

সুধীন ওদের কথায় কৌতুক বোধ করছিলো। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল একটা কথা মনে পড়তেই।

বললে, আবার অন্য রকমের পুরুষ মানুষও আছে রাণু।

—কি রকমের শুনি? ঠোঁট উল্টে রাণু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে, তোমার মত?

সুধীন হাসলো না। বললে, না, ধনঞ্জয়ের মত। জানো সুরজিৎ, ধনঞ্জয় বলে আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে ডাক্তারি পড়তো। তোমার দাদাও জানে। খুব বন্ধুত্ব ছিল আমার সঙ্গে। তারপর ঐ নীচের তলার ঐ স্কাউণ্ড্রেল ভগীরথটার মতই একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছিল সে।

সুরজিৎ চুপ করে রইলো, মাথা হেঁট করলে লজ্জায়।

সুধীন বললে, কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর···একদিন মাঝরাতে আমাদের হোষ্টেলের বাথরুমে দেখলাম, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে সে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সুধীন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, দুটো চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু পাছে মেয়েটির দুর্নাম হয় তাই চিঠিতে সে কথা ঘুনাক্ষরেও লেখে নি। শুধু লিখেছিল, 'নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলাম।' মানুষ ভুল করে, আবার ভুলের প্রায়শ্চিত্তও করে।

রাণু ঠোঁট টিপে হাসলো সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে।

ফিসফিস করে বললে, ঠাকুরপোর এখন ভুল করার বয়স।

করছো নাকি ?

সুধীন সামনে থাকায় সুরজিৎ লজ্জায় প্রতিবাদ করতেও পারলো না। এমন ভাব দেখালো যেন শুনতেই পায়নি।

নীলা একখানা বই নিয়ে কি যেন বলতে বলতে আসছিল, হঠাৎ সুরজিতের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল সে। পিছন ফিরে পালাতে যাচ্ছিল।

রাণু ডাকলো। —এই ঠাকুরঝি, পলোচ্ছো কেন? এসো এখানে।

নীলা ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ালো।

—বসো, চা খাবে না? ওকে অত লজ্জা কিসের? তোমার দাদা হয় ঠাকুরপো।

নীলা বসে পড়লো, বাঃ রে আমি বুঝি লজ্জা করছি ?

—পালাচ্ছিলে কেন তবে ? সুরজিৎ প্রশ্ন করলো।

—পালাচ্ছিলাম ? কক্ষনো না। তোমরা তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে, সুরজিৎদার সঙ্গে, যখন কথা বলো, আমি এলেই চুপ করে যাও। তাই।

সুধীন নীলার পিঠে হাত দিয়ে কাছে টেনে আনলো।

বললে, না রে না! তোকে দেখে চুপ করবে কেন ?

—না। অভিমানে ঠোঁট ফোলালো নীলা। বুঝি না যেন কিছু। তোমার অসুখ আমি জানি না যেন। কি অসুখ আমি শুনলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

নীলার অভিমান দেখে সুরজিৎ হেসে ফেললো হো হো করে। বললে, কি আবার অসুখ, সুধীনদার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তোমাকে দেখে তাই বলে চুপ করে যাই নাকি!

—হ্যাঁ তো।

সুধীন নীলার পিঠে হাত রেখে বললে, বেশ এই তোমাদের

ওপর কড়া হুকুম দিচ্ছি, নীলাকে দেখে চুপ করতে পাবে না তোমরা।

রাণু বললে, বেশ তো তা হ'লে যা হচ্ছিল—নীলার বিয়ের কথা, সেই যে ঠাকুরপো বলছিলে রাঙা টুকটুকে ছেলেটির কথা···

নীলা ছুটে পালালো রাগ দেখিয়ে। হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। কিন্তু নীলা পালাবার সময় ফেলে গেল হাতের বইখানা।

সুরজিৎ বইটা তুলে নিলো। একটা ইংরিজি বইএর বাংলা অনুবাদ। পাতা উল্টোতে উল্টোতে একটা পোষ্টকার্ড দেখতে পেলো সুরজিৎ। ইন্দিরার সেই চিঠিখানা : "রাণুমামীমা, কবে আসছেন শুনি ?—ইন্দিরা"। পোষ্টকার্ডটা চাপা দিয়ে অন্য পাতায় চোখ নিয়ে গেল সুরজিৎ, কিন্তু মন যেতে চাইলো না।

হঠাৎ প্রশ্ন করলো ও, ইন্দিরা কে রাণুবৌদি ?

ফিকফিক করে হাসলো রাণু। —নামটা খুব মিষ্টি লাগছে বুঝি ? আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছে ?

সুধীন হাসি চেপে উঠে গেল।

সুরজিৎ বললে, এমন লজ্জায় ফেলতে পারেন আপনি !

—কেন লজ্জায় ফেললাম কখন ?

—না। সুধীনদার সামনে যত আজেবাজে কথা।

—ও। তা তোমার যে ভাই এখন লজ্জা পাবার বয়েস তা তো মনে থাকে না। যাই হোক্ ইন্দিরা মেয়েটি কিন্তু বেশ, আলাপ করবে তো বলো। নিয়ে যাবার লোক পাচ্ছি না, না হয় তোমার সঙ্গে যাওয়াও হবে, তোমারও আলাপ হয়ে যাবে।

সুরজিৎ হেসে বললে, নিয়ে যাবার লোক না পান, আমি নিয়ে যেতে রাজি আছি, কিন্তু আলাপ করবার জন্যে মোটেই উদগ্রীব নই।

রাণু খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, বেশ তাই হবে।

প্রথম দিন সিদ্ধিমাতার প্রশ্নের উত্তরে ধনঞ্জয়ের আত্মহত্যার বিবরণটা বলতে পারে নি সুধীন। কিন্তু প্রতিদিনই কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে সিদ্ধিমাতা প্রশ্ন করতেন, আচ্ছা ধনঞ্জয়দা কোথায় বলতে পারো? কোন খবরই জানো না তার?

সুধীন প্রতিদিনই এড়িয়ে গেছে প্রশ্নটা। কিন্তু এও লক্ষ্য করেছে যে বাইরে ধনঞ্জয়ের সম্পর্কে রাগ দেখালেও কখনো কখনো উদাস রয়ে গেছেন সিদ্ধিমাতা, দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবেছেন।

সেদিনও চিরাচরিত প্রশ্নটা শুনলো সুধীন। কিন্তু খবরটা চেপে রাখতে ইচ্ছে হ'ল না।

বললো সব কথা। স্পাইরেল সিঁড়ির দিকের জানালার পাশে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতেই যে বীভৎস দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল, বললো সুধীন।

সিদ্ধিমাতা সব শুনেও বিশ্বাস করতে রাজি হ'ন নি প্রথমে। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উদাস স্বরে বললেন, তবু, তবু তাকে ক্ষমা করতে পারবো না আমি।

সুধীন বললে, ভুল করেছিল, কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও তো করে গেল সে।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—শরীরকে যন্ত্রণা দিয়ে ভগবান পাওয়ার ধর্ম্ম আমাকে শিখিয়ে যান নি গুরুদেব। তিনি বলতেন, যুক্তিই ধর্ম্ম।

অর্থহীণ প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে মনুষ্যত্ব ফিরে পাওয়ার সাধনা অনেক

বড়ো। নিজের জীবন দিয়েও পাপকে মুছে ফেলা যায় না, যদি না সে ত্যাগ অন্যের মঙ্গল করে।

সুধীন হেসে বললে, আমি তো তোমার শিষ্যদের মত বাণী শুনতে আসি নি অনুপমা।

সিদ্ধিমাতাও হাসলেন।

তারপর হঠাৎ বললেন, তোমরা বলো মানুষ নাকি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে জাহান্নামে যাচ্ছে। তাই শিক্ষিত মানুষরা নাকি এ সবে বিশ্বাস করে না।

—কেন, কথাটা কি সত্যি নয়?

—না। আমার শিষ্যদের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষিত। বিশেষ করে এই কোলকাতাতেই দেখ কত বড় বড় লোক আসে। হাই-কোর্টের একজন জজ তার একখানা বিরাট বাড়ী দান করছে আমাকে।

সুধীন হেসে বললে, সুখবর। ভাড়া বাড়ী ছেড়ে তোমার ঐ নতুন বাড়ীতে যদি এসে থাকতে দাও তা হলে আমিও শিষ্য হয়ে যাই।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—তোমরা যত না শিষ্য হ'চ্ছ তার চেয়ে দেখছি মেয়েরাই বেশি ভক্তিভরে আসে। কত এম এ, বি এ পাশ করা মেমসাহেব ধরনের মেয়েও কিন্তু মনেপ্রাণে ভগবানে বিশ্বাস করে।

সুধীন বললে, তা হলে আমার স্ত্রীকেও নিয়ে আসবো একদিন, দেখো বাণীটানী শুনিয়ে কিছু করতে পারো কি না। তবে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো, গুরু দেখার আগেই দীক্ষা নিয়ে বসে থাকে।

—দীক্ষা যদি দিতে হয় তো তোমাকে।

—আমি তো একদিন দীক্ষা নিয়েছিলাম, তুমিই শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলে না।

সিদ্ধিমাতা বললেন, সেদিন দীক্ষা তো নিজে থেকে নিতে চাও নি,

আমিই চেষ্টা করে মন তৈরী করেছিলাম তোমার।

—মানে ?

সুধীনের প্রশ্ন শুনে একটু অস্বস্তির লালিমা যেন চমকে উঠেই মিলিয়ে গেল সিদ্ধিমাতার মুখ থেকে।

বললেন, সব কথাই যখন বলেছি, তখন এটুকুই বা চেপে রাখি কেন। বলছি—

ব'লে চৌকিটার এক কোণে রাখা টাইম-পীসটার দিকে তাকিয়ে দেখলো কটা বাজে। ইতিমধ্যে একটি পাহাড়ী মেয়ে এসে দুটি ফুলের মালা পরালো এক কোণে টুলের ওপরে রাখা দেবদেবীর ছবিটার গলায়। চারপায়ার কম্বলটা ঝেড়ে বিছিয়ে দিলো আবার। পূজোর বেদীটা পরিষ্কার করলো, তারপর এসে বসলো একটু দূরে, চন্দনের পিঁড়ি আর কাঠ নিয়ে।

সিদ্ধিমাতা পাহাড়ী ভাষায় কি যেন বললেন।

মেয়েটি চন্দন ঘষতে ঘষতে উত্তর দিলো। তারপর একদিকে শ্বেতচন্দন আর একদিকে রক্ত চন্দন রেখে একটি রূপোর রেকাবী নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

সিদ্ধিমাতা তার হাত থেকে নিলেন রেকাবীটা, তারপর ইশারায় মেয়েটিকে চলে যেতে বললেন।

কিছুক্ষণ পরে হেসে বললেন, তোমরাই তো বলো যুদ্ধে আর প্রেমে নাকি অন্যায় বলে কিছু নেই!

সুধীন বললে, বলে ইংরেজরা, আমরা তাদের কথার নকল করি।

—যাই হোক্, বলো তো। আমিও কিন্তু একটা অন্যায় করেছিলাম।

—কি অন্যায় ?

—তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল কি করে ভুলে যাও নি

নিশ্চয় ?

—না।

—ধনঞ্জয়দার সঙ্গে যেদিন প্রথম এলে তুমি আমাদের বাড়ীতে, সেদিন মনে আছে তোমার, যাতায়াত করবার সময় পর্দ্দার আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলাম তোমাকে।

সুধীন বললে, যে কোন অপরিচিত লোক এলেই তো মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারে।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে দেখেই কেমন যেন ভালো লাগলো সেদিন। তারপর আলাপও হল তোমার সঙ্গে। প্রায়ই আসতে তুমি। আর তারই মধ্যে মনে মনে ভালবেসে ফেলে-ছিলাম তোমাকে।

সুধীন হাসলো। আর তার হাসি দেখে সিদ্ধিমাতাও হাসলেন।

বললেন, তারপর রোজই সারা রাত, সারা দুপুর ভাবতাম তুমিই হয়তো বলবে কিছু, বলবে যা শোনবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু···

সুধীন হেসে বললে,আশ্চর্য্য। অথচ একদিনও মনে হয় নি আমার।

—হবে কি করে! তুমি যে তখন অন্য একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখছো।

সুধীন লজ্জায় মাথা নীচু করলো এতদিন পরেও।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—যাক্ লজ্জা পেতে হবে না আর।

সুধীন হেসে ফেললো এবার। বললে, সত্যিই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম তার।

—হ্যাঁ, আর তার জন্যে এসে ইয়ার্কির ছলেই সাহায্য চাইলে আমার কাছে। তোমরা সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিলে কথাটা, কিন্তু আমি আরেকটু হ'লেই হয়তো কেঁদে ফেলতাম।

সুধীন বললে, কৈ এ কথা তো কোনদিন বল নি ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সিদ্ধিমাতা। অন্যমনস্ক ভাবেই যেন হাতের উল্টো পিঠটা ঘষে ঘষে বাঘছালের আসনটাকে মোলায়েম করলেন। তারপর চন্দনের রেকাবিটা কাছে টেনে নিলেন, আর পাশের হাতচৌকি থেকে ছোট্ট আয়নাটা। বাঁ হাতে ছোট্ট আয়নাটা ধরে চন্দনের টিপ পরতে পরতে হঠাৎ এক সময় নামিয়ে রাখলেন আয়নাটা।

বাঁ দিকে কাঠের গ্রন্থাধারে একখানা বই খোলা পড়েছিল। সেটা কাছে টেনে নিয়ে পরপর কয়েকটা পাতা উল্টে গিয়ে এক জায়গায় থেমে পড়লেন।

শ্লোক আওড়ালেন একটা।

সুধীন হেসে বললে, মানেটা ঠিক্ বুঝলাম না।

—উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক্ পথ মিথ্যা হ'লে ফলও মিথ্যা হবে। সিদ্ধিমাতা ব্যাখ্যা করলেন।

—বেশ তো। শোনা কথাই মনে হচ্ছে।

—কিন্তু বিশ্বাস করে ক'জন ? আমিও বিশ্বাস করতাম না। বলে, থেমে পড়লেন সিদ্ধিমাতা।

—এ কথা উঠলো কেন ?

সিদ্ধিমাতার কানের পাশে কি লাল বিদ্যুৎ চমকে গেল ?

মাথা নীচু করেই বললেন, লিলি ছিল আমার বন্ধু, প্রায়ই আসতো আমাদের বাড়ী। কিন্তু তুমি যে তাকে ভালবাসো তা কোনদিন মনে হয় নি। কারণ, অন্যের দিকে চোখ দেবার সময় ছিল না আমার, শুধু নিজের স্বপ্নেই নিজে বিভোর থাকতাম। তারপর হঠাৎ একদিন বলে বসলে তুমি, লিলির সঙ্গে আলাপ করতে চাও। তোমার মুখে-

চোখে অস্বস্তি আর লজ্জা দেখে বুঝলাম, কি ভুল করেছি। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করলাম না তোমার কাছে। হেসে হেসে তোমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বললাম যেন কোন দুঃখই পাই নি আমি।

সুধীন বিস্মিত হ'ল।—দুঃখ দিয়েছিলাম তোমাকে ?

—দুঃখ ? হাসলেন সিদ্ধিমাতা।—তুমি চলে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে কতক্ষণ যে কেঁদেছিলাম নিজেই টের পাই নি। তারপর হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। তোমাকে হারাতে হবে, তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে আরেকজনের মনের কোণে, এত বড়ো স্বার্থত্যাগ করা সম্ভব ছিল না তখন। তাই···

থেমে পড়লেন সিদ্ধিমাতা। কথা আটকে গেল তাঁর।

সুধীন সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো।—তাই, তাই কি করলে ?

—লিলিকে কিছুই বললাম না। জানতেও দিলাম না তাকে যে তুমি মুগ্ধ হয়েছো তার রূপে। বরং বললাম, তোমরা নাকি তাকে ঠাট্টা করো, তার চেহারা হাঁটা চলা সবকিছুই নাকি তোমাদের কাছে কৌতুকের বিষয়।

—সত্যি ? ছিঃ ছিঃ, এমন কেন করলে তুমি ? কেন মিথ্যে আঘাত দিলে তাকে !

—নিজের প্রয়োজনে। স্বার্থই যে তখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই তোমাকে এসে বললাম, লিলি রাজি নয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে, বললাম যে সে নাকি অপমান করেছে তোমাকে। ফল হ'লো। লিলিকে ভুলে গেলে তুমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুধীন।—প্রতিদান না পেলে সব প্রেমই মানুষ ভুলে যায়। প্রতিদান দিয়েই ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। দোষ তো আমার নয় অনুপমা !

—না। দোষ তোমাদের নয়। এই মিথ্যার পথেই তোমার মন পেলাম, তোমাকেও। কিন্তু বললাম তো অন্যায়ের পথে মঙ্গলকে পাওয়া যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত হারাতে হ'ল তোমাকে।

সুধীন চোখ তুলে তাকালো এবার।—তার জন্যে কি এখনো অনুশোচনা হয় তোমার ?

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন সিদ্ধিমাতা।—অনুশোচনা ? না না, কোন অনুশোচনা নেই আমার। শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছি আমি। সব মায়া, মোহ—সবকিছুকে অতিক্রম করে শান্তি পেয়েছি আমি।

মনে মনে হাসলো সুধীন। শান্তি ? শান্তি মানুষের জন্যে নয়। শান্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করলো না ও।

সামনের বিপদটা পার হতে পারলেই বুঝি শান্তি! সকলেই তাই ভাবে। রাণু ভাবছে সুধীনের অদ্ভুত রোগটা সেরে গেলেই শান্তি পাবে ও। জানে না, তখন হয়তো আরো এক অশান্তির মধ্যে পা বাড়াতে হবে। নীচের তলার বৌটি ভাবছে তার স্বামী ভগীরথ খুনের দায় থেকে রেহাই পেলেই বুঝি বা শান্তি। জানে না তারপর আবার সেই মদ্যপ স্বামীর কুৎসিত বাক্যবাণ, অসহ্য অত্যাচার। মহাদেববাবু ভাবছেন, ছোট মেয়ে নীলার বিয়ে দিলেই শান্তিতে কাশী বাস করতে পারবেন। ইন্দিরার বাবা ভাবছেন, বড়ো মেয়েকে নিজের ইচ্ছেয় শিক্ষিত ছেলের হাতে দিয়েই বুঝি এমন দুঃখবরণ। ইন্দিরা স্বেচ্ছায় নিজের জনকে বেছে নিলেও যে অনির্দ্দেশের অসহায়ত্ব দেখা

দিতে পারে তা বুঝতে পারছেন না।

কিন্তু শান্তি কি মানুষ সত্যিই পেতে পারে? শান্তি পাওয়া মানেই তো জীবনকে থামিয়ে দেয়া। না, শান্তি আসতে পারে শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ে, নদীর প্লাবনে, বাতাসের ঘূর্ণীতে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অশান্তির আগুন জ্বলবেই। জ্বলে বলেই তো জীবন কখনো গতি হারায় না, সমাজ বদলায়। মনের অশান্তিকে জলে বাতাসে নেভানো যায় না।

রাণু বললে, শান্তি পাবার জন্যেই সে-অশান্তি। বিধবা হওয়ার চেয়ে হয়তো মাতাল স্বামীকে নিয়ে স্বস্তি পাবে ভগীরথের বৌ।

—কে জানে।

রাণু উত্তর দিলো না। উল আর কাঁটা নিয়ে পা তুলে বসে পড়লো সামনের চেয়ারটায়। তারপর দ্রুত হাতে উল বুনতে বুনতে বললে, আমাদের কর্ত্তব্যটুকু আমাদের করতে হবে, ভালোমন্দ বিচারের ভার যাঁর হাতে তিনি দেখবেন।

—দেখবার চোখ তাঁর আছে কি না সেটাই প্রমাণ হচ্ছে না।

রাণু হেসে বললে, রাস্তা পার হবার সময় তোমার কাজ গাড়ী আসছে কি না দেখা, গাড়ী যে চালাচ্ছে সে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে কিনা দেখতে গেলে চাপা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সুধীন চমকে চোখ তুলে তাকালো রাণুর দিকে, তারপর হেসে ফেলে বললে, সিদ্ধিমাতার কাছে যাতায়াত সুরু হয়েছে বুঝি? এমন কথামৃত বেরুচ্ছে যখন মুখ থেকে!

রাণু ঠোঁট টিপে হাসলো।

বললে, যাই বলো বাপু, ভগীরথের কিছু একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। দিনরাত পড়ে পড়ে কাঁদছে বৌটা।

সুধীন গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। বললে, যে ব্যবস্থা করছি তাতে শুধু নিজের মনকেই প্রবোধ দেয়া যায়। কিন্তু ভগীরথকে বাঁচাতে হ'লে প্রচুর টাকার দরকার।

—টাকা কোথায় পাবে ও ?

—সে কথা তো আমিও বলি। নেহাৎ ভাগ্য থাকলে তবেই বাঁচানো যাবে, আর কোন ভরসা নেই। ভাগ্য আর টাকা এই দুটোর রাজত্ব চলছে পৃথিবীতে। কখনো ভাগ্য জিতে যায়, কখনো টাকা। আর অনেকের কপালে ভাগ্যই টাকা জুটিয়ে দেয়, টাকা ভাগ্য জুটিয়ে দেয়।

রাণু বিরক্ত হয়ে বললে, অতশত বুঝি না আমি, ভগীরথকে বাঁচাতে হবে, শুধু বৌটার চোখের জল দেখেই বাঁচাতে হবে।

সুধীন ধীরে ধীরে বললে, টাকা জোগাড় করতে না পারলে তা একেবারেই অসম্ভব।

—অসম্ভব !

কথা শুনে দু'জনেই চমকে ফিরে তাকালো। দেখলো কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভগীরথের বৌ। এখুনি বুঝি ঢলে পড়বে অজ্ঞান হয়ে। রাণু ছুটে গিয়ে ধরলো তাকে, কপাটে ঠেস দিয়ে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলো সে।

সুধীন তাকিয়ে দেখলো। মাথার ঘোমটা খসে গেছে, আঁচল খসে পড়েছে বুক থেকে। দুটি গভীর কালো চোখে যেন সব হারানোর উদাস দৃষ্টি, সমস্ত মুখ থেকে যেন রক্ত শুষে নিয়েছে কে ! দু'চোখের নীচে দুটি কালো গহ্বর যেন। যে শরীরে ছিল স্বাস্থ্যের, যৌবনের প্রাচুর্য, তা যেন দীর্ঘদিনের রোগভোগে শীর্ণ, পাণ্ডুর। ম্লান মুখে চোয়ালের হাড়দুটো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, উস্কোখুস্কো চুল, শরীরে ক্লান্তি

আর রুগ্ন অবসাদ।

বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুধীন। কি আশ্চর্য! এই ক'টা দিনের মধ্যে এতখানি পরিবর্ত্তন, এমন ভাবে মৃত্যুর কাছে এগিয়ে চলেছে বৌটি? সুধীনের মনে পড়লো সেই সুন্দর মুখ, সেই সরল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীরের কমনীয়তা। আর আজ!

হঠাৎ ছুটে এসে সুধীনের পা জড়িয়ে ধরে মাটিতে বসে পড়লো বৌটি।—বলুন কত টাকা লাগবে, কত টাকা লাগবে বলুন। ওকে বাঁচাতেই হবে যেমন করে হোক, বাঁচাতেই হবে ওকে।

সুধীনের পায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বৌটি। সুধীন তার পায়ে তরল উত্তাপের স্পর্শ পেল, অশ্রু ঝরে পড়লো তার পায়ে।

রাণু ধীরে ধীরে টেনে তুললো তাকে। বললে, ছিঃ অত উতলা হয়ো না ভাই, বাঁচাবে বৈকি, নিশ্চয়ই বাঁচাবে। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে কি ফাঁসী দেয়া যায়? ভগবান নেই নাকি! ছিঃ কাঁদে না, ওঠো ভাই, ওঠো।

তাকে টেনে তুললো রাণু। তবু কান্না থামলো না তার। বললে, কত টাকা চাই বলুন আপনি, কত টাকা দরকার বলুন। আমি ঠিক্ জোগাড় করে দোব।

আর তার পর থেকে কিছু কিছু টাকা প্রতিদিনই এনে দিতে সুরু করলো সে। কি করে, কোত্থেকে আসছে এ টাকা তা কেউই প্রশ্ন করলো না। না সুধীন, না রাণু।

স্নরজিৎ প্রথমটা রাজি হয় নি। অর্থাৎ মনে মনে যথেষ্ট ইচ্ছে থাকলেও মুখে অনিচ্ছা জানিয়েছিল। ভয় হয়েছিল, রাণুবৌদি ভাববে বেথুনে পড়া ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ও বুঝি বা পা বাড়িয়েই আছে।

কিন্তু অসম্মতি জানাতে না জানাতে বিদ্রূপ করে বসলো রাণু।

বললে, ছি ছি, এতো লজ্জা তোমার? একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে এই ভয়ে তার বাড়ীই যাবে না?

শুনে লজ্জায় মিইয়ে গেল স্নরজিৎ। বললে, ভয় না আরো কিছু। তোমার ঐ বেথুনে পড়া মেয়েই দেখবে লজ্জাবতী লতার মত কুঁকড়ে যাবে আমাকে দেখলে, মুখ তুলতে চাইবে না।

—ইস্। দেখো নি তো তাকে। মুখে খৈ ফোটে তার সদা সর্ব্বদা। বরং দেখবো হয়তো তুমিই গুটিসুটি মেরে বসে থাকবে চুপচাপ আর পায়ের নখে মুখ দেখবে নিজের।

স্নতরাং শেষ অবধি রাণুকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দিরাদের বাড়ী যেতে হ'ল স্নরজিৎকে।

ইন্দিরার মা এসে কপাট খুলে দিলেন। তারপর রাণুকে চিনতে পেরেই একমুখ হেসে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বারকয়েক ডাক দিলেন ইন্দিরাকে, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ এলো না।

বসবার জন্যে একটা ছোট গালিচা পেতে দিলেন। রাণু বসলো এক কোণে, স্নরজিৎ ভাঁজ করা চেয়ারটা টেনে নিয়ে এক পাশে সরে গেল।

—ইন্দিরা কি নেই নাকি বাড়ীতে? রাণু জিগ্যেস করলো ইন্দিরার মাকে। আর সেই ফাঁকে লুকিয়ে একবার সুরজিতের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো।

ইন্দিরার মা মেয়ের ওপর বিরক্ত হয়েই যেন আরেকবার ডাক দিলেন, তারপর রাণুকে বললেন, আছে বৈকি, ছাদের ঘরে বসে হয়তো পড়াশুনো করছেন।

—পড়ায় খুব মন বুঝি? রাণু হাসলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কোথায় আছে? আমিই যাই বরং।

—যাবে? তা যাও। বাতে পা খসে পড়ছে আমার, আমি ও সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতে পারি না, কিছু মনে করো না।

রাণু সুরজিৎকে বসতে বলে সটান দোতলায় উঠে গেল নির্দ্দেশ মত। খোলা কপাটে উঁকি দিয়ে দেখলো টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাতার পাতায় খসখস করে কি লিখে চলেছে ইন্দিরা।

পা টিপে টিপে একেবারে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো রাণু।
—কি লেখা হচ্ছে এত মন দিয়ে?

চমকে ফিরে তাকালো ইন্দিরা।

রাণু হেসে বললে, এ বয়সে তো জানি মন দিয়ে একটা জিনিষই লেখা যায়।

ইন্দিরা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো যেন। —কি আশ্চর্য, আপনি? রাণুমামীমা আপনি! বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। এলেন তা হ'লে শেষ অবধি?

রাণুকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের খাটটায় বসিয়ে দিলো ইন্দিরা। —বসুন। চুপ করে বসে থাকবেন, ওঠবার নাম করবেন না একবারও। সারা দিন আজ আপনার সঙ্গে গল্প করবো!

রাণু হেসে বললে, বেশ তো, আমিই কি উঠতে চাইছি নাকি? কিন্তু কি লিখছিলে এত মন দিয়ে?

ইন্দিরা হেসে উঠলো খিলখিল করে।—দেখতেই পাচ্ছেন রুল টানা খাতা, নীল রঙের কাগজ হ'লে নয় বলতে পারতেন। কিন্তু এলেন কার সঙ্গে? একা নকি?

—না, যাঁর সঙ্গে এসেছি তিনি নীচে বসে বসে চটছেন হয়তো।

—সেকি? ওপরে নিয়ে এলেই তো পারতেন! বসুন ছুটে গিয়ে ডেকে আনছি তাঁকে, বারবাব ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ছেন, ট্রিকটা কিছুতেই শেখাচ্ছেন না আমাকে। বলেই দুরদার করে নীচে নেমে গেল ইন্দিরা।

রাণু ইচ্ছে করেই তার ভুল ভাঙালো না।

ছুটতে ছুটতে নেমে এসেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই থমকে থেমে পড়লো ইন্দিরা। সুরজিতের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই কে যে বেশি লাল হ'লো বোঝা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বের হ'ল না। ইন্দিরা আবার ছুটে পালাবে না কিছু বলবে ভেবে পেলো না। আর সুরজিৎও ঘেমে উঠলো, কথা খুঁজে পেলো না কোন। যেন নেহাৎ অনধিকার প্রবেশ তার।

ইন্দিরাই শেষ পর্য্যন্ত কথা বললো। কথাগুলো জড়িয়ে গেল যেন। জিগ্যেস করলো, রাণু মামীমার সঙ্গে কি···

কোনক্রমে একটি বার চোখ তুলে সম্মতি জানিয়েই আবার মাথা নীচু করলো সুরজিৎ।

ইন্দিরা তোৎলামি করে বসলো।—আপনি, চ-চলুন না ওপরে।

কথার জবাব দিতে হবে এই ভয়েই হয়তো উঠে দাঁড়ালো সুরজিৎ। ইন্দিরার পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এলো।

ছোট্ট পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারটা এগিয়ে দিলো ইন্দিরা, আর রাণুর কাছে লজ্জা ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলো সুরজিৎ।

রাণুর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেই ইন্দিরা উঠে পড়লো আবার। —যাই চা-টা নিয়ে আসি।

রাণু হেসে বললে, সে হবে এখন, অত ছটফট করতে হবে না তোমাকে, চুপ করে বসো তো।

ইন্দিরা বসলো না, ছুটে চলে গেল আবার।

রাণু বললে, কেমন ছটফটে মেয়ে দেখছো তো? তোমার মত লাজুক নয়।

—হুঁ। অস্ফুট স্বরে সুরজিৎ বললে, আর মনে মনে তৈরী হয়ে নিলো লজ্জা কাটিয়ে ওঠার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরেই দু'হাতে দু'গ্লাস জল নিয়ে ঢুকলো ইন্দিরা।

সুরজিৎ সেদিকে তাকিয়ে বললে, আপনারা চায়ের সঙ্গে জল খান বুঝি?

জলের গ্লাসদুটো তেপায়া টুলটার ওপর রাখতে রাখতে ঘাড় কাৎ করে হাসলো ইন্দিরা, বাঁকা চোখে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে বললে, টায়ের সঙ্গে খাই।

সুরজিৎ বুঝলো এ মেয়ের সঙ্গে বুদ্ধিতে পারবে না, তার চেয়ে পুঁথিগত বিদ্যের আলোচনা করাই ভালো।

আর এই একটা বিষয়ে মেয়েরা হার স্বীকার করার জন্যে তৈরী হয়েই থাকে।

'স্যামসন এগনিষ্টিস' পড়তে ভালো লাগে কি লাগে না, শেক্সপীয়ারের সিমবেলিন গল্পটা সত্যিই অশ্লীল কিনা, মেরী এন্তয়নেৎ না মেরী কুইন

অফ স্কস্ কার জীবন বেশি ট্র্যাজিক ইত্যাদি আজেবাজে অনেক তর্ক আর আলোচনা করে অনেক সময় কেটে গেল। আর তারই ফাঁকে কখন রাণু উঠে গিয়ে ইন্দিরার মা'র সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে তা বোধহয় ওরা টেরও পায় নি, কিম্বা ইচ্ছে করেই এমন ভাব দেখিয়েছে দু'জনে যেন তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিটা ওদের চোখেই পড়েনি।

তারপর একসময় ডাক এলো নীচে থেকে, দু'জনেই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, পাশাপাশি। হাতে হাত হয়তো লাগলো, হয়তো ইন্দিরার শাড়ীর আঁচল উড়ে এসে পড়লো সুরজিতের গায়ে।

ইন্দিরার মা আবার আসবার আমন্ত্রণ জানালেন দু'জনকেই।

খোলা কপাটের একদিকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইন্দিরা। বললে, আবার আসবেন রাণুমামীমা।

বললো রাণুকে, কিন্তু অনুরোধের শান্ত চোখজোড়া রাখলো সুরজিতের মুখের ওপর।

রাণু হেসে বললে, এবার তোমরা একদিন না গেলে আর আসবো না।

ইন্দিরা বললে, যাবো।

যাবো! সারা রাস্তাটা কি একটা গান যেন গুণগুণ করে বাজলো সুরজিতের মনে। ইন্দিরা বলেছে 'যাবো', ছোট্ট একটি কথা। কিন্তু এই একটি শব্দের মধ্যে, ওর ঐ শান্ত চোখের স্বীকৃতিতে কত কি লুকোনো অর্থ খুঁজে পেলো সুরজিৎ।

রাণু একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো সুরজিতের মুখের দিকে, তারপর নিজের মনেই ঠোঁট টিপে হাসলো।

নানা অজুহাত দেখিয়ে দোরগোড়া থেকেই সুরজিৎ বিদায় নিয়ে গেল।

রাণু উঠে এলো ওপরে। আল্‌না থেকে আটপৌরে সাড়ী ব্লাউজ নিয়ে সটান গিয়ে ঢুকলো কলঘরে। কপাটে খিল্ দিয়ে সাড়ী বদলাতে বদলাতে আপনা থেকেই কখন একটা গ্রাম্যগানের কলি ভাঁজতে সুরু করলো। সার্টিনের ব্লাউজটা খুলে লংক্লথের আঁট ব্লাউজটা পরে নিয়ে বাঁ হাতে কাপড়-চোপড় আর ডান হাতে বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এলো।

আলনায় সিল্কের শাড়ীটা ভাঁজ করে তুলে রেখে এসে ঢুকলো ঘরে। দেখলো খাটের ওপর বসে একরাশ কাগজপত্তরের ওপর নিবিষ্ট মনে ঝুঁকে পড়ে কি যেন পড়ছে সুধীন।

দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে বার তিনেক চিরুনির টান দিয়ে রাণু বললে, ঘুরে এলাম ইন্দিরাদের বাড়ী থেকে।

—হুঁ। অস্ফুটে একটু ছোট্ট করে উত্তর দিলো সুধীন, হয়তো বা অন্যমনস্ক ভাবেই।

তা দেখে কাছে এগিয়ে এলো রাণু। কাগজগুলোর ওপর অনুসন্ধানী চোখ ফেলে বললে, কি এত পড়ছো মন দিয়ে ?

—না কিছু না। টাইপ করা পাতার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগলো সুধীন।

—কিছু না, দেখতে পাচ্ছি কি পড়ছো, আর 'কিছু না' বলে দিলে ?

—আঃ বিরক্ত করো না এখন। রাণুর দিকে ফিরে না তাকিয়েই

সুধীন বললে।

একটু কেন, বেশ যেন আহত বোধ করলো রাণু। সুধীনের সামনে থেকে কাগজগুলো তুলে নিয়ে অভিমানের চোখে তাকালো ও।

এবার সুধীনও চোখ তুললো। দু'জনে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সুধীনের চোখে খানিকটা বিরক্তি, খানিকটা অসহায়ত্ব। রাণুর চোখে অভিমান আর ক্রোধ।

কিছুক্ষণ চোখাচোখি তাকিয়ে রইলো দু'জনে, তারপর দু'জনের মুখেই হাসি ফুটলো। কৌতুকের হাসি।

সুধীনই কথা বললো প্রথমে।

বললে, ভগীরথের মামলার কাগজপত্তর দেখছিলাম।

—কি দেখলে? পাশে বসে পড়লো রাণু গায়ে গা লাগিয়ে। —সত্যি বাঁচানো যাবে তো ওকে? তা নইলে কিন্তু গলায় দড়ি দেবে বৌটা। কাল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো, জল খাবার জন্যে বারান্দায় বেরুতেই শুনলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বৌটা।

সুধীন কোন উত্তর দিলো না। ও যা দেখেছে, যা পড়েছে তার পর ভরসা দেয়া মিছে।

পরে অস্বীকার করেছে বটে উকীলের পরামর্শে কিন্তু ধরা পড়ার পর পুলিশের কাছে সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল ভগীরথ।

বয়সে প্রৌঢ় ছোট সাহেবের মেয়ে নমিতা। ছিপছিপে দোহারা গড়ন, হাসি হাসি মুখ। বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত এক কলেজের নামকরা এক অধ্যাপকের সঙ্গে। তখন ভগীরথ ছিল বাইরের মানুষ। ছোট সাহেবকে খুশি করার জন্যে কখনো সখনো যেতো, দু'চারটে ফাই-ফরমাস

করে দিতো। শুধু একটি দিন ছোটসাহেবের গাড়ীতে সারা শহর ঘুরেছিল। ড্রাইভারের পাশে বসেছিল ভগীরথ, পিছনে ছোট সাহেব আর নমিতা। হু'চারবার লাজুক লাজুক চোখ তুলে তাকিয়েছিল নমিতা, চোখোচোখি হয়েছিল ভগীরথের সঙ্গে, চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। সেদিন ওরা কোন বড়ো দোকানে ঢুকতে বাকী রাখেনি। গয়নাগাটি, সাড়ীকাপড়, আসবাবপত্র—প্রায় হাজার দশেক টাকার মার্কেটিং করে ফেরবার সময় মাঝপথে নেমে পড়েছিল ভগীরথ। ছোট সাহেব বলেছিলেন পরের দিনেও গিয়ে বিয়ের জোগাড়যন্ত্র করে দিতে। গিয়েছিল ভগীরথ, নামী ব্যাণ্ডপার্টিকে বায়না দিয়ে এসেছিল নিজের হাতে, সানাইয়ের গৎ লিখিয়ে দিয়ে এসেছিল। তারপর যথাদিনে ফটকের সামনেটা লাল শালুতে মোড়া হ'ল। নহবৎখানা বাঁধা হ'ল, রোশনচৌকি বসলো···করুণ সুরে সানাই বাজতে সুরু করলো সকাল থেকে। বিয়ে হয়ে গেল নমিতার, বাড়ীর পুরোনো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েজামাইকে বিদায় দিলেন নমিতার বাবা মা। ছোটসাহেবের মনে সেদিন কি ফুর্ত্তি, কি আনন্দ। অথচ থেকে থেকে কেমন যেন আনমনা হয়ে যান, চোখ মোছেন বারবার।

সেদিন মাঝরাত পর্য্যন্ত সঙ্গে মুখোমুখি বসে একটার পর একটা হুইস্কির বোতল খুলেছে ভগীরথ আর ছোটসাহেব। নেশায় বুঁদ হয়ে চেয়ারেই ঢলে পড়েছিল হু'জনে।

ছোট সাহেব বলেছিলেন, নমির বিয়ে দিয়ে ঘরটা এত ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে ভাবি নি। ইচ্ছে হচ্ছে ফিরিয়ে আনি আবার।

ভগীরথ সান্ত্বনা দিয়েছিল, ভাবছেন কেন স্যার, হুদিন পরেই তো আবার আসবে।

কথা ফলেছিল ভগীরথের। ফুলশয্যার পরের দিন ভোরবেলাতেই ঝিকে সঙ্গে নিয়েই চুপিচুপি ফিরে এলো নমিতা।

নমিতার মা বিস্ময়-চোখে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে। মেয়ের ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন। দেখলেন, ছু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে নমিতার।

তারপর একসময় ফিসফিস করে চাপা কান্নার স্বরে বললো নমিতা যা কিছু বলবার। কে জানে হয়তো সব কথা বলতে পারে নি ও, আভাসেই বুঝে নিয়েছেন নমিতার মা।

ছিঃ ছিঃ। আগে বলতে কি হয়েছিল? বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল কেন তবে? ফুলশয্যার রাত্রির জন্যে কি কেউ এমন একটা গ্লানির কথা তুলে রেখে দেয়?

ছোটসাহেব দাঁতে পাইপ চিবিয়ে বললেন, স্কাউণ্ড্রেল। স্ত্রীকে বললেন, আমার বন্দুকটা দাও, আ'ল শুট হিম।

কিন্তু তার আগেই ভগীরথ এসে হাজির হ'ল। যে হাতে বন্দুক তুলে ধরার কথা সেই হাতে মদের গেলাস নিয়ে বসে পড়লেন ছোট সাহেব।

তারপর মদের নেশায় ভগীরথকে খুলে বললেন সব কথা। —মেয়েটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে এর চেয়ে ভালো হ'তো। কার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি ওর, জানো?

বিস্মিত হয়ে ভগীরথ প্রশ্ন করেছে, সে কি স্যার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্কাউণ্ড্রেলটা ফুলশয্যার রাত্রেই সব কথা খুলে বলেছে নমিতাকে। এণ্ড আস্ক্‌ড্‌ ফর হার প্লেটোনিক লাভ্‌।

ভগীরথ স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

ছোট সাহেব বলেছেন, আমি আবার বিয়ে দোব নমিতার।

নমিতার মা বলেছেন, না। তার চেয়ে পড়াশুনো নিয়েই থাকুক ও।

নমিতাও শেষ অবধি মা'র কথাতেই সায় দিয়েছে। আর ভগীরথের

ওপর ভার পড়েছে মাঝে সাঝে একটু সাহায্য করার।

সেই সূত্রেই নমিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ভগীরথের। ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম, প্রেম থেকে প্রবৃত্তি।

দিনের পর দিন যায় আর একটি একটি করে চুলের রঙ সাদা হয়ে যায় নমিতার। শরীরে তার যে কলঙ্কের বীজ জন্ম নিয়েছে তাকে বিনষ্ট করবার জন্যে ভগীরথ তখন শুধুই পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ অপরাধ, এ অন্যায়কে ছোট সাহেব কখনই ক্ষমা করবে না। চাকরী তো যাবেই, তা ছাড়া···ছোট সাহেবের শোবার ঘরে দেয়ালে টাঙানো দো-নলা বন্দুকটা দেখেছে ভগীরথ। আর, আর শুধুই কি নিজের ভয়? নমিতার জীবনকেই বা কলঙ্কিত করবে কেন? এক লজ্জা থেকে পালিয়ে এসে আরেক লজ্জার ঘোমটায় নিজেকে ঢাকবে কি করে? নমিতার কান্না, অনুরোধ, ব্যথা-থম্‌থম্ মুখ সহ্য করতে না পেরে একটি ক্লিনিকের সাহায্য নিতে হয়েছিল ভগীরথকে। আর সেখানেই হাতুড়ে ডাক্তারের ভুলে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় নমিতার।

চতুর্দ্দিক থেকে ভয় যেন ভিড় করে এসে ভগীরথকে গ্রাস করে ফেলে। নমিতার সমস্ত শরীরকে খণ্ড খণ্ড করে একটি বড়ো স্যুটকেশে পুরে মাঝ রাত্রিতে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে যায় ভগীরথ, খুনের দায় থেকে বাঁচবার জন্যে।

কিন্তু নিয়তিকে এড়ানো যায় না।

স্যুটকেশটি জলে ফেলতে যাওয়ার মুহূর্ত্তে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ভগীরথ।

আর ধরা পড়ার পর সব কথা স্বীকার করে ভগীরথ। পরে অবশ্য উকীলের পরামর্শে সব কিছু অস্বীকার করে সে।

উকীলের কাছ থেকে চেয়ে আনা সেই নকলটার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল সুধীন।

রাণু চুপচাপ পাশে বসে পড়তেই সুধীন বলে উঠলো, অসম্ভব।

—কি অসম্ভব ?

—জেনেশুনে একটা খুনীকে বাঁচাতে চেষ্টা করা।

রাণু বললে, আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাপার আছে। খুনী কখনো নিজে স্বীকার করে ?

সুধীন কথার উত্তর দিলো না, একটা ক্রুদ্ধ হাসি হাসলো। রাণু বুঝলো রাগটা ভগীরথের ওপর।

তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ নামিয়ে বাঁ হাতের চুড়িগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, কিন্তু ওকে না বাঁচালে তুমিও তো খুনের দায়ে পড়বে। বৌটা গলায় দড়ি দেবে নির্ঘাৎ। তা ছাড়া তুমি কথা দিয়েছ ওকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুধীন বললে, কথা যখন দিয়েছি, চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু বৌটার ওপর এতটুকু সহানুভূতি নেই আমার। স্বামী এমন একটা পাষণ্ড জেনেও কিনা তাকে বাঁচাতে চায় ?

রাণু হাসলো।—তোমরা পুরুষরা বুঝবে না। বাঙালী ঘরের বৌ স্বামীর সব দোষ ক্ষমা করতে পারে।

—পারে ?

মাথা নেড়ে সায় জানালো রাণু।

—তুমি পারবে ?

আবার মাথা নাড়লো রাণু।

সুধীন জীবনের কোন কথাই গোপন রাখে নি শুধু দু'জনের কাছ থেকে। প্রথম জন রাণু, আর ডাক্তার সেন দ্বিতীয় জন।

ফরাসী সাইকিয়াট্রিষ্ট ডাক্তার আঁদ্রের পরামর্শ নিয়ে ডাক্তার সেন মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সুধীনের।

সব কিছু শুনছিলেন তিনি দিনের পর দিন। অতীতের রহস্য, বর্ত্তমানের ঘটনা।

ডাক্তার সেন তাই হেসে বললেন, গ্রামেই তুমি ভালো ছিলে সুধীন। এখানে এসে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়ছো আর পাঁচজনের কাজে।

সুধীন হাসলো।

ডাক্তার সেন ছিলেন সুধীনের সহপাঠী। একই সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করে দু'জনে। তাই সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠই ছিল।

রাণু এক পেয়ালা চা আর রেকাবীতে করে কিছু মিষ্টি এনে রাখলো ডাক্তার সেনের সামনে। ঘোমটাটা সামান্য একটু টেনে দিয়ে বললে, সেখানে থাকলেও এই অবস্থা তা তো জানেন না। নিজের বাড়ীর খবর রাখেন না, কে কোথায় বিপদে পড়েছে তার খোঁজ নিয়ে বেড়ান।

চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে ডাক্তার সেন বললেন, একি, সুধীনের চা কৈ ?

রাণু হাসলো।—দিনে কত কাপ চা মানুষ খেতে পারে। ওকে এখন আর খেতে হবে না।

ডাক্তার সেন হাসলেন।—আমার স্বাস্থ্য বুঝি ওর চেয়ে ভালো? না কি শহুরে লোকদের স্বাস্থ্য না থাকলেও চলবে?

রাণু ঠোঁট টিপে হাসলো। উত্তর খুঁজে পেলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সুরজিৎকে আসতে বলবেন। আজকাল তো কৈ আসেই না।

—বলবো। বলেই হেসে উঠলেন ডাক্তার সেন।—সেদিন দেখি ওর এক বান্ধবী গিয়ে হাজির। আপনি নাকি আলাপ করিয়ে দিয়েছেন?

—ইন্দিরা! বিস্মিত হয়ে চোখ কপালে তুললো রাণু।—ওমা, এত আলাপ হয়ে গেল কবে? আমি তো শুধু একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম।

সুধীন হেসে বললে, সুরজিৎ তা হ'লে যেমন বোকাসোকা হয়ে থাকে তেমন নয়!

তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠলো।

রাণু ডাল পোড়ার গন্ধ পেয়ে ছুটে গেল, বললে, ডালটা নামিয়ে আসি।

রাণু চলে যেতেই সুধীন বললে, যাক্, আর কতদিন থাকতে হবে বলো। চিকিৎসা শেষ হচ্ছে কবে?

ডাক্তার সেন বললেন, চিকিৎসা হয়ে গেছে, এখন তোমার ওপর নির্ভর করছে।

—অর্থাৎ?

—ডাক্তার আঁদ্রে বলেছেন, এটা তুমি নিজেই বানিয়েছো। অটোসাজেশন আর কি! একটা লোক যদি অবিরত ভাবে তার টি-বি:হয়েছে সত্যিই তার টি-বি হতে পারে, আর টি-বি রুগীর যদি মনের জোর থাকে, তা হ'লে সে সেরে উঠতেও পারে। কার্ডলাক্

আর লাভ লাক্···এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই তোমার বিশ্বাস হয়ে গেছে তুমি তাস খেললেই জিতবে।

সুধীন হাসলো।—আমিও ডাক্তার, ভুলে যাও কেন।

ডাক্তার সেনও হাসলেন। বললেন, সেই তো অসুবিধে, সাধারণ রুগী অনেক আগেই সেরে যেতো। আসলে তুমি প্রথম দিকে কয়েকবার জিতেছো য়্যাকসিডেণ্টেলি। হঠাৎ জিতে গিয়েই তোমার বিশ্বাস বেড়ে গেছে। কিংবা এই যে আট দশবার খেলেছো জীবনে, প্রত্যেক-বারই জিতেছো ভাগ্যক্রমে। একই লোক তিন চারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও যদি বেঁচে যেতে পারে ভাগ্যক্রমে, কিংবা একই লোক যদি তিন চারবার লটারীতে প্রাইজ পেতে পারে তা হ'লে এটাই বা অসম্ভব হবে কেন? কিন্তু আমার মনে হয় এটা অটোসাজেশনেও হতে পারে।

—হুঁ। চুপ করে রইলো সুধীন।

ডাক্তার সেন বললেন, যেদিন জানতে পেরেছো যে অনুপমা সত্যিই তোমাকে ভালবাসতো, বিশ্বাস করতো, প্রতারণা করবার জন্যে নয়, বিশ্বাসের মর্য্যদা রাখবার জন্যেই ট্রেণ থেকে নেমে গিয়েছিল, সেদিন থেকেই তোমার মনের জোর কমে গেছে। তোমার এখন সন্দেহ হয় তাস খেলতে গেলে হয়তো হেরে যাবো। এবং সত্যিই হেরে যাবে তুমি।

—সত্যি? উদ্বিগ্ন দেখালো সুধীনকে।

—হ্যাঁ। উত্তর দিলেন ডাক্তার সেন।

—কিন্তু মাথায় হঠাৎ যন্ত্রণা সুরু হ'ত কেন? কেনই বা পাগলামি সুরু করতাম?

হাসলেন ডাক্তার সেন।—এটুকু তোমার জানা উচিত ছিল। যা একেবারেই আশা করা যায় না এমন কোন আঘাত পেলে যেমন

মানুষ পাগল হয়ে যায়, তেমনি ঠিক্ যা আশা করছি তা যদি অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় তাতেও মানুষ রহস্যের কিনারা করতে না পেরে পাগল হতে পারে। আবার অনেক সময় সাধু সন্ন্যাসীও হয়ে যায়।

—এখন ?

—এখন তাসের খেলায় হেরে যাবে তুমি।

হতাশায় চোখ তুলে তাকালো সুধীন।—হেরে যাবো ? হেরে যাবো এখন ?

যেন কত বড়ো একটা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সুধীন। যেটাকে দুরারোগ্য ব্যধি মনে করেছে ও এতদিন সেইটেই আজ যেন মস্ত বড়ো গৌরব মনে হ'ল। মনে হ'ল সে গৌরব হারিয়ে ফেলেছে ও।

অনুপমা। অনুপমা তার জীবনের অজ্ঞাত রহস্যের কপাট খুলে দিয়ে মনে শান্তি এনে দিয়েছে ভাবতো সুধীন। আজ মনে হ'ল, অনুপমা তার সব শক্তি যেন কেড়ে নিয়েছে।

ডাক্তার সেন চলে যাবার পরও এই একটা কথাই ওর মাথায় ঘুরতে সুরু করলো। অটো সাজেশন···য়্যাকসিডেণ্ট ! তা হ'লে সুভগ কোন গ্রহের দৃষ্টি নয় ! অমানবিক কোন শক্তি নয় ? ডাক্তার সেনের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারলো না সুধীন। 'তুমি হারবে !' 'হ্যাঁ সত্যিই হেরে যাবে তুমি !' যে শক্তিটাকে এতদিন অভিশাপ মনে হয়েছে সে অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে গেল ডাক্তার সেন, অভিশাপের ভাষাতেই যেন। 'তুমি হারবে', 'সত্যি হেরে যাবে তুমি।'

অনুপমা, অনুপমা। আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়েছো তুমি। কি প্রয়োজন ছিল রহস্যের পর্দা সরিয়ে ?

কোর্ট থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল সেদিন।

আইনের সূক্ষ্ম কারিকুরি দেখিয়ে ক্ষীণ একটা আশা দেখিয়েছে উকীল। চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে বিপক্ষের একজন সাক্ষীকে একটু এদিক ওদিক করিয়ে দিতে হবে। আর চাই একজন নামী আইনজীবী। কথার তোড়ে যিনি সহজ প্রমাণটুকুকে দুর্ব্বোধ্য আর জটীল করে তুলতে পারবেন। আর এ দুটো কাজই কি করে সম্ভব তা চোখ টিপেই বুঝিয়ে দিয়েছে ঝানু উকীলবাবু। অর্থাৎ টাকা।

টাকা? কোর্টের এলাকা থেকে ভিড় ঠেলে ঠেলে ট্রাম ষ্টপেজের দিকে আসতে আসতে কথাটা বারবার বোলতার গুণগুনুনির মত মাথায় ঘুরেছে সুধীনের। নিজের মনেই হেসেছে ও। এত যে বড়ো বড়ো কথা, আইনের সমতা, ধনী নির্ধন দু'দলের নিরপেক্ষ বিচার…এই সব কথাগুলো এতদিন ও শুধু বাইরে থেকেই বিশ্বাস করে এসেছে। তফাৎটা কোথায় ভেবে দেখেনি এতদিন।

টাকা! যে নিরপরাধ তার বিরুদ্ধেও যখন মামলা রুজু হয়, তাকে বাঁচতে হয়ে টাকা খুইয়ে। হয়তো টাকার অভাবে বিনা দোষেই সাজা পেতে হয়। আর টাকা খরচ করতে পারলে অপরাধীও বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে, পুলিশের খাতার মসীচিহ্ন মুছে যেতে পারে, বিরুদ্ধ দলের সাক্ষী জেরার সামনে উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারে, আর সবচেয়ে বড়ো সুবিধে, ধুরন্ধর উকীল ব্যারিষ্টারের অণুবীক্ষণ চোখে হাজারো অবিশ্বাস্য প্রমাণ আবিস্কৃত হতে পারে।

টাকা। আইনকানুন, বিচার বিবেচনা সবই কি তা হলে টাকার চাকাতেই ঘুরছে দিনরাত ?

এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলো সুধীন, আর সঙ্গে সঙ্গে রাণু বললে, এসেছো ? বাঁচা গেল।

—কেন, কি হ'ল ?

রাণু ইশারায় নীলাকে কি যেন বললে। তারপর মৃদু হেসে ফিরে তাকালো সুধীনের দিকে। নীলাও তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

—কি ব্যাপার বলো তো ? বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলো সুধীন।

রাণু উত্তর দিলো, ব্যাপার কিছুই নয়। তোমার ঐ ভগীরথের বৌ তো আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি।

—কেন ?

রাণু হেসে বললে, আজ এ মন্দিরে কাল ও মন্দিরে রোজ তো টেনে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে। পূজো দেবার মানসিক করছে এক একজায়গায়, আর সঙ্গে যেতে হচ্ছে আমাকে।

সুধীন ঠাট্টা করে বললে, তুমি তো বেঁচে গেছো তা হলে। দিব্যি সঙ্গী পেয়ে গেছো।

রাণু কপট ক্রোধ দেখালো চোখেমুখে।—কত তীর্থ-ই ঘুরিয়ে আনলে! আমি সঙ্গী পেয়ে খুশি হবো না ?

—ঘুরে না এলে কি হবে, চিঠিতেই তো পূজো মানৎ সব সারছো।

রাণু চটে গেল এবার।—নিজের জন্যে করেছি ? বাবলাডির ন্যাংটেশ্বর তলার মাদুলী সে তো ভগীরথের বৌয়ের জন্যে। দিনরাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তাই বললাম, একটা মাদুলী পরলে যদি কাজ হয়।

সুধীন হেসে বললে, সে তো ভালই, কিন্তু আজ আরার কি হ'ল ?

—সে পাঁচবার এসে খোঁজ করে গেছে তোমার, নীলা ডাকতে গেছে, নিজেই এলে বলবে। রাণু উত্তর দিলো।

আর মিনিট কয়েক. পরেই সামনে এসে দাঁড়ালো ভগীরথের বৌ। একটু দূরত্ব রেখে। ঘোমটা আরো একটু টেনে দিয়ে।

চোখ তুলে সেদিকে তাকালো সুধীন। তাকিয়ে বিস্মিত হ'ল। কি আশ্চর্য্য! এই কি ভগীরথের বৌ? দিন কয়েক দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, কিন্তু তা বলে এই ক'দিনে মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তন হতে পারে? নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলো না সুধীন।

প্রথম দিন যে মেয়েটির শরীরে অমন স্বাস্থ্যের জোয়ার দেখেছিল, দেখেছিল সুন্দর একটি ব্যথাম্লান মিষ্টি মুখ, মাত্র কয়েকদিনের দুশ্চিন্তাতেই সে শরীর ভেঙে পড়েছে, সে মুখ সৌন্দর্য্য হারিয়েছে। সুধীনের মনে হ'ল, যেন দীর্ঘদিন রোগভোগের পর অস্থিসার একটি রুগ্ন শরীর নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভগীরথের বৌ। সমস্ত মুখে বিষাদের ছায়া, সাদা চাদরের মত ফ্যাকাশে মুখ, চোখে উদাস অর্থ হীন দৃষ্টি।

ভগীরথের বৌ চোখ নীচু করে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ফিসফিস করে বললে, আমাকে একবার সিদ্ধিমাতার কাছে নিয়ে যাবেন?

—সিদ্ধিমাতা? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলো সুধীন।

উত্তর এলো তেমনি চাপা গলায়।—শুনেছি উনি নাকি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। যদি একবার নিয়ে যেতেন!

চোখ তুলে আবার তাকালো সুধীন। দেখলো দু'চোখে জল ভরে এসেছে বৌটির। আর লক্ষ্য করলো তার হাতে গলায় একরাশ মাদুলী তাবিজের ভিড়। এতগুলি মাদুলী আর তাবিজ অমন সুন্দর

চেহারা শান্ত স্নিগ্ধ মুখটাও কুৎসিত করে তুলেছে মনে হ'ল। তবু, তবু সুধীন বুঝলো ঐগুলোর মধ্যে কত গভীর বেদনাবোধ, কত আশঙ্কার অশ্রু লুকিয়ে আছে। স্বামীকে বাঁচাতে হবে, স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে—এই একটাই মনের মন্ত্র ওর এখন। কিন্তু স্বামী বাঁচলেও কি ও নিজে বাঁচতে পারবে? দিনে দিনে এ কি ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে ও, আত্মবিনাশের পথে?

ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিল সুধীন, ইচ্ছে ছিল বাড়ী ফিরেই বিছানায় শুয়ে পড়বে। কিন্তু ভগীরথের বৌয়ের জল-ভরা অনুনয়ের চোখের দিকের তাকিয়ে অসম্মতি জানানো অসম্ভব।

সুধীন রাণুর মুখের দিকে এক চোখ তাকিয়ে বললে, চলুন।

শিষ্যের দেয়া নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছেন তখন সিদ্ধিমাতা।

সারা বাড়ীটা জমজমাট। ফটকের বাইরেও রীতিমত ভিড়। অবসরপ্রাপ্ত জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুরু করে সেই সব হালফ্যাশানি মেয়েরা যারা ঠোঁট বেঁকিয়ে ইংরেজী উচ্চারণে বাংলা বলে, সকলেই দর্শন প্রার্থী হয়ে এসেছে। কেউ দীক্ষা নিতে, কেউ বা প্রার্থনা জানাতে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে দু'খানা ঘর পার হয়ে সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ঘরে এসে পৌঁছলো ওরা। আর ঘরে ঢুকেই মুগ্ধ হয়ে গেল রাণু। হয়তো ভগীরথের বৌও।

রাণু অস্ফুটে বললে, এই অনুপমা?

সুধীন ঘাড় নাড়লো। তবু যেন বিশ্বাস হ'ল না রাণুর। এমন রূপ কি সাধারণ একটি মেয়ের হতে পারে? এ যে দেবদুর্লভ জ্যোতি।

একটি কাঠের চৌকিতে দামী, গালিচার ওপর পদ্মাসন হয়ে বসে

আছেন সিদ্ধিমাতা। উদ্দাম যৌবনের দেহ ঘিরে একটুকরো বাঘছাল। আর সেই বাঘছালের আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে সুগঠিত জানু, কণ্ঠনিম্নের যৌবনতরঙ্গ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গালে রক্তাভা। আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে অলজ্জ দৃষ্টির প্রখরতা।

এক একজন দর্শনার্থী সামনে গিয়ে প্রণাম করছে, ফলমূলের প্রণামী রাখছে সামনে, সিদ্ধিমাতা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রাণু। আর অভিভূত মোহগ্রস্তের মত এগিয়ে গেল ভগীরথের বৌ। সিদ্ধিমাতার পায়ের কাছে ভেঙে পড়লো সে। কান্না-ঝরা চোখ তুলে তাকালো, আশায় আশায়।

সিদ্ধিমাতা হাত তুলে কি যেন স্বস্তিবচন আওড়ালেন।

বললেন, ভয় নেই। তোর প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

সজল চোখে হাসি ফুটে উঠলো এবার।

রাণুও ধীরে ধীরে প্রণাম করে ফলমূলের ডালিটা নামিয়ে রাখলো সিদ্ধিমাতার পায়ের কাছে। তারপর ভগীরথের বৌকে তুলে ধরে ফিরিয়ে আনলো।

ফেরার মুখে ভগীরথের বৌ সহাস্যে বলে উঠলো, শুনলেন, কি বললেন মা শুনেছেন? বললেন, প্রার্থণা পূর্ণ হবে। ও ছাড়া পাবে, ছাড়া পাবে ও।

ওদের পিছনে পিছনে সুধীনও ফিরে আসছিলো সিদ্ধিমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই। এই ভিড়ে এত শ্রদ্ধানিবেদনের প্রতিযোগিতায় অনুপমার সঙ্গে কি করে দেখা করবে ও। কি কথা বলবে?

কিন্তু সিদ্ধিমাতা ওকে লক্ষ্য করেছিলেন, ইশারায় পার্শ্বচরদের একজনকে কি যেন বললেন।

সুধীন বেরিয়ে আসার আগেই সে এসে বললে, শুনুন।

স্নুধীন ফিরে দাঁড়ালো।

—মাতাজী আপনাকে কাল সকালে একবার আসতে বললেন, একা।

একাই এসে উপস্থিত হ'ল স্নুধীন পরের দিন সকালে।

দীক্ষাঘরে উঠে গেলেন সিদ্ধিমাতা। অন্য সকলকে বাইরে যেতে বলে চৌকিটা দেখিয়ে দিলেন স্নুধীনকে।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ফুলমাসীমার খবর পেয়েছি।

—ফুলমাসীমা? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো স্নুধীন।

সিদ্ধিমাতা মুক্তোর মালার মত ছ'সারি দাঁতের ঈষৎ ঝিলিক দিয়ে হাসলেন।—হ্যাঁ, এসেও ছিলেন নাকি এখানে। চিনতে পারি নি। হয়তো ঘোমটা ঢাকা দিয়ে এসেছিলেন, কিংবা দূর থেকে দেখেই চলে গেছেন।

স্নুধীন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, কি করে বুঝলে?

চৌকির শীতলপাটির তলা থেকে একখানা খাম বের করে স্নুধীনের হাতে দিলেন সিদ্ধিমাতা।

বললেন, পড়ে দেখো।

চিঠিটা পড়লো স্নুধীন, পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলো।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—আমাকেও সংসারী হতে বলেছেন। ভেবেছেন সকলেই ওঁর মত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখতে এসেছিলেন আমার গুরুজী। ভেবেছিলাম, তাঁর মন থেকে ফুলমাসীমার সব স্মৃতি বুঝি বা মুছে গেছে। কিন্তু···

কিন্তু মানুষের মনের ভেতর কখন কি ঘটে তা কি কেউ বলতে পারে? সিদ্ধিমাতার ওপর আশ্রমের ভার দিয়ে কুম্ভমেলা দেখতে এসেছিলেন তিনি। মাথায় জটা, দীর্ঘ শ্মশ্রু, গৈরিকবাস। এ চেহারা দেখে স্বামীকে চিনতে পারা সম্ভব নয়। আর দীর্ঘদিনের স্বামীপরিত্যক্তা ফুলমাসীমার চেহারাও বদলে গিয়েছিল অনেক। তা সত্ত্বেও গঙ্গার ঘাটে স্নান সেরে উঠে আসতে আসতে ফুলমাসীমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল গুরুজীর। দু'জনেই পরস্পরকে অতিক্রম করে গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তকয়েক পরেই ফুলমাসীমা ঘুরে দাঁড়ালেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সেই সন্ন্যাসীকে। কি আশ্চর্য্য! এ মুখ তো ভোলবার নয়, এ চোখের দৃষ্টি যে তাঁর বুকের গোপনে আঁকা হয়ে আছে। চতুর্দ্দিকে খোঁজাখুঁজি করেও সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন না ফুলমাসীমা। জানতে পারলেন না, গুরুজী দূরে একটি দেয়ালের পাশে লুকিয়ে লক্ষ্য করছিলেন তাঁকে।

দিন কয়েক ভিড় খুঁজে খুঁজে শেষে ব্যর্থ বেদনার মন নিয়ে ফিরে এলেন ফুলমাসীমা। আর তার দিনকয়েক পরেই এক সন্ধ্যায় কপাটের কড়া নাড়লো এক সন্ন্যাসী।

বাড়ীর ঝি কপাট খুলে দিলো। সন্ন্যাসী ফুলমাসীমার নাম করে দেখা করতে চাইলো। তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ফিরে যেতে পারলেন না তাঁর আশ্রমে। গৈরিকবাস, দীর্ঘশ্মশ্রু, মাথার জট সবই ঘুচে গেল ক্রমে ক্রমে।

আর সেই ইতিহাস জানিয়ে ফুলমাসীমা লিখেছেন, 'সন্ন্যাসী হয়ে মন ভরে নারে পাগলি, সুখী হবার, সংসারী হবার চেষ্টা কর। ও যখন ফিরে এলো, বেশ বুঝলাম ও সংসারী হতে চায় আবার। তবু লজ্জায় ভাঙতে পারতো না প্রথম প্রথম। দূরে দূরে থাকতে চাইতো।

কিন্তু দূরেই যদি থাকবার ইচ্ছে ছিল তো ফিরবে কেন? সেটুকু বুঝেছিলাম বলেই নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিলাম, আর নির্লজ্জ হয়ে যে ভুল করি নি এখন বুঝতে পারছি। ও একটা ভালো চাকরী পেয়েছে। সন্ন্যাসীঠাকুর বলে ডাকলে ভীষণ চটে যায় এখন। বলে মণ্টুর সামনে যেন ও-কথা না বলি, বাপ সন্ন্যাসী হয়েছিল শুনলে হয়তো ছেলেও বড়ো হয়ে গেরুয়া পরবে এই ভয়। আমি যাকে বাঁধতে পারিনি একফোঁটা মণ্টু তাই পেরেছে। তাই বলি, সংসারী হয়ে সুখী হবার চেষ্টা কর।"

চিঠিটা পড়ে সুধীন সেটা ফেরৎ দিলো সিদ্ধিমাতাকে। বললে, ঠিকই বলেছেন ফুলমাসীমা। তোমার এ সবের মধ্যে কোথায় যেন ফাঁকি রয়েছে অনুপমা।

সিদ্ধিমাতা হাসলেন।—এই ফাঁকির মধ্যেই কিছু হয়তো খুঁজে পেয়েছি। সুখ কাকে বলে জানো, কি জন্যে বেঁচে থাকা?

—সুখের জন্যেই তো বাঁচা।

—না। জীবনের জন্যে বেঁচে থাকা, জীবনকে অন্বেষণ করার জন্যে। আমরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছি একটি মাত্র জিনিষ—জীবন। জীবনকে যে খুঁজে পায় সেই সুখী হতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি জীবনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

সুধীন চুপ করে রইলো। এ সব দুর্বোধ্য তত্ত্বকথা বোঝে না ও।

সিদ্ধিমাতা তবু বললেন, এই জীবন খুঁজে পাবো ভেবেই এসেছিলাম এখানে। দেখলাম, এখানে ত্যাগের মধ্যেও স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে, শ্রদ্ধার মধ্যেও আত্মপ্রেম। এরা সবাই জীবনকে হারিয়ে সুখ খুঁজছে।

সুধীন হাসলো।—হবে হয়তো।

সিদ্ধিমাতাও হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, তাই সবকিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মানস সরোবরের উদ্দেশে। সেখানে কেউ এসে নিজেকে মনে পড়িয়ে দেয় না, অহঙ্কারী করে তোলে না। নিজের অস্তিত্ব না ভুলতে পারলে জীবনকে খোঁজবার চেষ্টা করবো কি করে। আর সে অন্বেষণ থেমে গেলে তো আমিও থেমে যাবো।

অনুপমা চলে যাবে, প্রথমটা বিশ্বাস হয় নি সুধীনের। কিন্তু সেদিন ঘুরতে ঘুরতে সিদ্ধিমাতার বাড়ীতে গিয়ে দেখলো চারপাশ খাঁ খাঁ করছে। লোকজন নেই।

ফটকের দারোয়ান শুধু বললে, মাতাজী মানস সরোবর চলে গেছেন।

বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে চললো সুধীন। মনে পড়লো সেই সব ফেলে আসা অতীতের দিনগুলি। অনুপমা, অনুপমা!

সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। একটা অচেনা গলিতে ঢুকে পড়লো সুধীন নিরুদ্দেশ ভাবেই।

সারা গলিটায় একটা মাত্র গ্যাসপোষ্ট। গ্যাসের ম্লান আলো পড়েছে রাস্তাটায়। আর, দূর থেকে সুধীন দেখতে পেল গ্যাস-পোষ্টের নীচেই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে গল্প করছে। কখনো খিলখিল করে হেসে উঠছে মেয়েটি, কখনো বা বুকে বই চেপে চলে যাবার উপক্রম করছে। আর ছেলেটি তখনই তার হাত ধরে টেনে রাখছে, যাতে মেয়েটি পালাতে না পারে। দু'জনেই যৌবনের প্রথম বসন্তের স্বপ্ন দেখছে যেন। যেমন সুধীন আর অনুপমা দেখেছিল, রঙ বুনেছিল মনে মনে।

আরো একটু কাছে এগিয়ে আসতেই দু'জনকেই চিনতে পারলো

সুধীন। আশ্চর্য্য! সময় কত বদলে গেছে। কত স্বাভাবিক, স্বাধীন মন হয়ে গেছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের। সুধীন ভাবলো। লিলি! লিলিকে ওর ভালো লেগেছিল। চোখের পরিচয়ে মন জানাজানি হয়েছিল। তবু তো এগিয়ে যেতে পারেনি সুধীন।

ইন্দিরা আর সুরজিৎ?

একদিনের পরিচয়েই সম্ভাবনাকে কাছে টেনে নিয়েছে ওরা।

ওদের চোখে পড়ার আগেই চট্ করে ফিরে এলো সুধীন। এমন মধুমুহূর্ত্তের বিশ্রম্ভকূজনে বাধা দিতে ইচ্ছে হ'ল না।

ইন্দিরা আর সুরজিৎ কেউই টের পেলনা। ওরা তখনও সব ভুলে কথা আর হাসিতে মেতে আছে।

নীচের তলা থেকে একটা চাপা গোঙানি ভেসে আসছিল অনেকক্ষণ থেকে। দুপুরে মাদুরের ওপর ক্লান্ত শরীর এলিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল রাণু, চোখের পাতা জুড়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল একটা চাপা গোঙানি যেন ভেসে আসছে। কান সজাগ করে শুনলো রাণু। হ্যাঁ নীচের তলা থেকেই আসছে। ঘুম ছেড়ে গেল। উঠে বসলো রাণু।

ভগীরথের বৌ? হ্যাঁ, ভগীরথের বৌ কাঁদছে হয়তো পড়ে পড়ে। কয়েকদিনই তো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, খোঁজ নেয়া হয়নি। কে জানে, কোন দুঃস্বপ্ন দেখে, কিংবা স্বামীর ফাঁসী হবে এই আশঙ্কায় ভয় পেয়ে কাঁদছে হয়তো।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো রাণু। সান্ত্বনা দেয়া দরকার। এই ভাবে যদি দিনরাত কাঁদে আর শরীরের যত্ন না নেয় তা হ'লে বৌটাও মারা যাবে। এর মধ্যেই তো অমন সুন্দর স্বাস্থ্যে ভরা রূপ অস্থিসার প্রেতিনীর মত হয়ে উঠেছে। যেন কত বছর ধরে রোগে ভুগছে।

রূপসী মেয়ের ভাগ্যে সুখ থাকে না, এ কথাটা ভগীরথের বৌকে দেখে বহুবার মনে হ'য়েছে রাণুর। ব্যথা অনুভব করেছে।

নীচে নেমে এসে ভেজানো কপাটের পাশে দাঁড়ালো রাণু, তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলো।

একটা লেপ চাপা দিয়ে কাঁপছে বৌটা, আর থেকে থেকে প্রলাপ বকছে। দেখতে পেল রাণু। ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে বসলো।

গায়ে হাত দিয়ে দেখলো জ্বরে সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে।

বললে, এ কি, জ্বর হয়েছে বলোনি কেন ভাই। ডাকলেই তো পারতে?

ভগীরথের বৌ কোনরকমে চোখ তুলে তাকালো রাণুর দিকে, ক্লান্ত ব্যথিত চোখ রাখলো রাণুর মুখের ওপর। কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়লো তার গাল বেয়ে।

রাণুর হাতটা চেপে ধরলো ও। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো, আমি, আমি আর টাকা দিতে পারবো না দিদি, আপনি ওকে বাঁচান, ওকে বাঁচান আপনি।

রাণু সান্ত্বনার স্বরে বললে, কথা তো দিয়েছি ভাই, কেন মিছে ভয় পাচ্ছ, উনি ছাড়া পাবেন। সিদ্ধিমাতাও তো বললেন।

ভগীরথের বৌ ফুঁপিয়ে উঠলো আবার।—কিন্তু আমি যে আর টাকা দিতে পারবো না; কি হবে?

টাকা দিতে পারবো না? কি হবে? কথাটা হঠাৎ নতুন একটা অর্থ নিয়ে রাণুর চোখের সামনে ফুটে উঠলো। চোখ পড়লো সামনের ছোট্ট টুলটার ওপর। ছাইদানিতে একরাশ সিগারেটের টুকরো, একটা খবরের কাগজ।

কি আশ্চর্য্য। এতদিন তো এ-কথা ভাবে নি রাণু।

—আপনার কাছে আমি কিছু লুকোবো না দিদি। এ পাপের টাকা দিয়ে ওকে বাঁচানো যাবে না। বলে রাণুর হাতদুটো চেপে

১১-অ

ধরলো ও।

রাণু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ডাক্তারের ব্যবস্থা করিগে, কোন ভয় নেই তোমার।

—না, না। আমার জন্যে নয়, ওকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন আপনি। আমি জানি, ও কোন দোষ করেনি, ও কোন দোষ করতে পারে না।

রাণু বিষণ্ণ হাসি হাসলো।

ভগীরথের বৌ আবার বলে উঠলো, বন্ধুরা ওকে জোর করে মদ খাওয়াতো, তাই কোন কোনদিন অত্যাচার করতো ও। আমার কিন্তু লাগতো না মোটেই। পরে ও আবার ক্ষমা চাইতো, জানেন। সত্যি, বিশ্বাস করুন ওর মত লোক হয় না। এত ভাল মন। আমি কাছে নেই, কি করে ওর দিন কাটছে বলুন তো? ওদের দেয়া খাবার কি খেতে পারছে?

রাণু ওর জলভরা চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো। চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে।

আর সন্ধ্যেবেলায় সুধীন ফিরে আসতেই এমন এক অনুরোধ জানিয়ে বসলো যা সুধীন কোনদিন কল্পনাও করে নি।

ভগীরথকে বাঁচাতে হলে টাকা লাগবে। আইনের ফাঁক আবিষ্কার করার জন্যে প্রয়োজন ভাল উকীল। কিন্তু সে-টাকা কোথেকে আসবে, কেমন ভাবে, তা জানতে চায় নি কেউই। দিনে দিনে কিছু কিছু টাকা জোগাড় করে এনে দিয়েছে ভগীরথের বৌ, তার ঘরের জিনিষপত্তর আসবাব ইত্যাদি বিক্রী হতেও দেখেছে সুধীন আর রাণু। দেখেছে, ভগীরথের বৌয়ের শীর্ণ হাতের চুড়ি কঙ্কণ সরে গিয়ে শুধুমাত্র একটি নিঃসঙ্গ শাঁখায় পৌঁছেছে আভরণ, কানের দুল গলার

হার নিরুদ্দেশ হয়েছে। কখনো সখনো সন্ধ্যের পর হয়তো ভগীরথের বৌ বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে, আর তখন তার হাতে রঙিন কাঁচের জলচুড়ি, কানে কণ্ঠে মেকি-সোনা চিকচিক করেছে—সন্দেহও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু স্বামীর জন্যে যার দুশ্চিন্তা আর কান্নার অন্ত নেই তাকে সন্দেহ করবে ওরা কোন চোখে ?

সব ঘটনাটা জানিয়ে রাণু তাই বললে, সতী সতী করি আমরা, ও কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো।

সুধীন শুধু ঘাড় নাড়লো। সত্যি এমন একটা আকস্মিক আঘাতের কল্পনাও করতে পারে নি ও।

রাণু ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু এ পাপ থেকে রক্ষা করো ওকে। এ অমঙ্গল, এ টাকায় ভালো হবে না ওর।

সুধীন চিন্তিত মনে চোখ তুলে তাকালো।—কি করবো তা হ'লে ? কোথায় পাবো এত টাকা ?

রাণু আস্তে আস্তে বললে, তুমি পারো, তুমি পারবে।

—আমি ? কোথায় পাবো এত টাকা ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করলো রাণু। বললে, তুমি, তুমি তো ইচ্ছে করলেই পারো।

—ইচ্ছে করলেই পারি ? বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিপ্রশ্ন করলো সুধীন।

রাণু চাপা গলায় বললে,…তাস। তাস খেললেই তো তুমি জিতবে। তারপর আমি সারিয়ে দোব আবার, এর আগের মতই।

—তাস ? তাস খেলতে বলছো তুমি ? জুয়া খেলতে বলছো ? কি আশ্চর্য্য, চিরকাল যা নিষেধ করে এসেছো তাই বলছো আজ ?

রাণু হাসলো।—হ্যাঁ বলছি। এ তো নিজেদের স্বার্থে নয়, লক্ষীটি শোনো আমার কথা, তুমি ইচ্ছে করলেই পারবে ভগীরথকে বাঁচাতে,

ওর বৌকে পাপের পথ থেকে সরিয়ে আনতে।

—কিন্তু, কিন্তু আমি তো আর জিতবো না রাণু। হতাশার স্বর ফুটে উঠলো সুধীনের গলায়। বললে, আমি হারবো, হেরে যাবো আমি।

'তুমি হারবে'। 'হেরে যাবে তুমি'। ডাক্তার সেনের কথাগুলো নতুন করে বেজে উঠলো সুধীনের কানের পাশে। সত্যি। সত্যিই কি হেরে যাবে সুধীন?

অটোসাজেশন! আত্ম-ইচ্ছা। কার্ড-লাক্, লাভ-লাক্। প্রেমে যে বঞ্চিত, তাসের খেলায় সে জিতবেই। এতদিন এই কথাটাই বিশ্বাস করে এসেছে সুধীন। কিন্তু এখন? প্রেমে তো বঞ্চিত নয় ও। অনুপমা তো অভিনয় করে নি। বরং প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেই তো ওর পথ থেকে সরে গিয়েছিল।

আর, আর সেই মেয়েটি? লিলি? লিলিই তো নাম তার। সেও তো আঘাত দেয়নি সুধীনকে। হয়তো তার মনের কোণেও সুধীনের জন্যে একটু জায়গা ছিল সেদিন। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পারে নি সুধীন। প্রেমে ব্যর্থ নয় ও, তাসের খেলাতেই বা সুভগ হবে কি করে?

য়্যাকসিডেণ্ট। হ্যাঁ মাত্র বার কয়েক তো জিতেছে সুধীন, জিতেছে ঘটনাক্রমে। তা বলে তাসের খেলায় জিতবেই ও এমন বিশ্বাস কেন হয়েছিল! সব মিছে, সব ভুল।

তুমি হারবে। হেরে যাবে তুমি। ডাক্তার সেনের কথাটা বারবার মনে পড়লো ওর।

আশ্চর্য্য। এই স্তোকবাক্য শুনে খুশি হয়ে উঠেছিল সুধীন, রাণু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। আনন্দে চকচক করে উঠেছিল ওর দু'চোখ।

ভালো হয়ে গেছে, ভাল হয়ে গেছে স্বামী। আর সেই উন্মাদ দৃষ্টিতে সারা শরীর জলে যাবে না। স্বামীর কলঙ্ককে লুকিয়ে রাখতে হবে না লোকচক্ষু থেকে।

কিন্তু আজ রাণুর ইচ্ছে হ'ল ডাক্তারের সব কথা অবিশ্বাস করতে। মনে হ'ল, না, সুধীন এখনো জিতবে, তাসের খেলায় কেউ হারাতে পারবে না তাকে। আর সুধীন হতাশার চোখ মেলে তাকালো রাণুর দিকে। যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও, সব মূল্য মুছে গেছে ওর। বন্দী পাখির মত চঞ্চল হয়ে উঠলো সুধীন।

না, আজ শেষ বারের মত অন্ততঃ জিততে হবে। ভগীরথকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে ভগীরথের বৌকে।

এক তাড়া নোট এনে সুধীনের হাতে গুঁজে দিলো রাণু। হয়তো একশো, হয়তো দু'শো। বললে, জিতবে, জিতবে তুমি।

কোন কথা বললো না সুধীন। বেরিয়ে পড়লো ধীরে ধীরে। যৌবনদিনের পরিচিত সেই ফিরিঙ্গি-পাড়ার হোটেলটার কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লো সুধীন।

আর রাণু ধীরে ধীরে বললে, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

অন্ধকার জমাট বাঁধছে তখন, রাস্তায় পড়েছে শুধু গ্যাসবাতির মিহি রোশনাই। আর দু'পাশের দোকানের আলো ছিটকে এসে পড়ছে কোথাও কোথাও।

ফিরিঙ্গি সাহেব মেমের দল শো-কেস দেখে দেখে চলেছে, কেনা-কাটা জিনিষপত্তর বয়ে নিয়ে। মাঝে মাঝে প্রসাধিত লালিমার মুখে হাসি ছিটিয়ে দু'চারজন বাঙালীনীও চলেছে। কেউ দোকানের দিকে

কেউ বা ফিরছে ট্রামের উদ্দেশে। ট্যাক্সির আনাগোনার অন্ত নে। ওদিকে একটা সিনেমা হাউসের নিওন জ্বলছে, সামনের পোষ্টারে অর্দ্ধনগ্ন নারীদেহের উদ্দাম ছবি। দর্শকের চোখের দৃষ্টিকে বুকের তরঙ্গে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা। আশে পাশে দু'চারজন, মুখের ছাপে বয়সের চিহ্ন যাতে ধরা না পড়ে তার চেষ্টায়, আলো থেকে দূরে দূরে চলাফেরা করছে। ছবিটার মতই তাদের বেশবাসের কার্পণ্য। উদ্দেশ্যও যে একই তা সহজেই ধরা পড়ে। একটা রেস্তঁরার সামনে একজন দাঁড়িয়েছিল চোখে চতুর হাসি নিয়ে, ফিরিঙ্গি আঁটসাঁট পোষাকে লোভানি জেলে।

পাইপটা হাতের পিঠে ঠুকে পরিষ্কার করলো সুধীন; তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঠি দিয়ে পাইপের ফুটোটা পরিষ্কার করতে করতে এপাশ ওপাশে কি যেন খুঁজলো।

এবার এগিয়ে এলো মেয়েটি। হেসে বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি পাইপ পরিষ্কার হয়, চলো একটা বারে যাওয়া যাক্।

—বার? নাক সিঁটকে উঠলো সুধীন। বললে, ঠিক্ আছে, তোমাকে একটা ড্রিঙ্কের জন্যে ষ্ট্যাণ্ড করতে রাজি আছি, কিন্তু আমার একটা খবর চাই।

—খবর? কপালে ভুরু তুললো সে।—কেন, আমাকে বুঝি চার্মিং মনে হচ্ছে না? অভিমানেই যেন ঠোঁট ফোলালো সে।

হেসে ফেললো সুধীন। বললে, না না সে খবর নয়। তারপর চোখ টিপে বললে, জুয়ার অড্ডা কোথায়?

শুনেই খুশিতে উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো মেয়েটি। বললে, ও চমৎকার। ইউ'ল বি এ নাইস কম্প্যানিয়ন। চলো নিয়ে যাচ্ছি।

ব'লে পাশের গলিটায় ঢুকে পড়লো সে, সুধীনও পিছনে পিছনে।

সুধীনের হাতের ভেতর নিজের হাতটাকে শিকল পরিয়ে গায়ে গা ঘঁষে যেতে যেতে মেয়েটি বললে, আমার নাম লিজা—লিজাবেথ। তোমার ?

কি একটা মনগড়া নাম বললো সুধীন।

—সো স্থইট! হাসলো লিজা। তারপর আরো একটা শীর্ণ গলির ভেতর ঢুকলো।

একটা কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দিলো বারকয়েক। আর একটি বুড়ি মেম এসে কপাট খুলে দিয়ে বললে, কাকে চাই ?

লিজা হেসে উঠলো।—আমি লিজা, আর এ আমার বয় ফ্রেণ্ড।

ওদিকের তেতলার বারান্দা থেকে এক ফালি হাল্কা আলো এসে পড়েছে। তবু গা-ছমছম অন্ধকার সামনের সিমেণ্ট চটা উঠোনে বারান্দার এক পাশে একটা থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল জন তিনেক ফিরিঙ্গি গুণ্ডা। খালি গা, ট্রাউজারটা গুটিয়ে গুটিয়ে হাঁটু অবধি তোলা। লোকগুলো এক চোখ ফিরে তাকিয়েই আবার নিজেদের গল্প সুরু করলো।

আর আলো জলা ঘরটার কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মুখে চরিত্র আঁকা একটি মেয়ে। বুড়ির পিছন পিছন লিজা ঘরে ঢুকলো, আর তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢোকবার সময়ে মেয়েটি ঈষৎ কৌতুকে ধাক্কা দিলো সুধীনকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না ও। সুধীনের মনে তখন একটাই চিন্তা, একটাই ভয়। ক্রমশই যেন অধৈর্য্য হয়ে উঠছে।

টাকা, টাকা।

সব টাকা জিতে নেবে ও। তাসের খেলায় অদ্ভুত এক সুভগ গ্রহের দৃষ্টি আছে সুধীনের ওপর। ও জানে ও জিতবেই। এমন তো কতবার

খেলেছে। কতবার জিতেছে।

আলো জ্বালা ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে ওপাশের বারান্দায় পৌঁছে কাঠের শীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সুধীন।

ছাত্রাবস্থায় কয়েকবার এই ধরনের জায়গায় এসেছিল সুধীন, গেঁয়ো জমিদারের বলগাহীন কোন ছেলেকে বন্ধু পেয়ে। তারপর একসময় নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, নেশা ছেড়ে গিয়েছিল। আজ এত বছর বাদে এ পাড়ায়, বিশেষ করে এই বাড়ীটায় ঢুকে কেমন যেন ভয় পেল সুধীন। নোংরা সরু কাঠের সিঁড়ির শব্দে কেমন যেন আতঙ্ক বোধ করলো।

কোত্থেকে যেন মাঝে মাঝে মদের উগ্র গন্ধ আসছিল, আর কড়া চুরুটের গন্ধ।

দোতলার বারান্দায় টবে সাজানো পাতাবাহার আর নাম-না-জানা রঙ বেরঙের ফুল। আর দরজায় একটা ভারী পর্দা। বেসুরো পিয়ানোর শব্দ আসছে কাছের কোন ঘর থেকে। আর হঠাৎ হট্টগোল।

বুড়িকে ফিসফিস করে বুঝিয়ে দিয়েছিল লিজা। বুড়ি বললে, কাম ইন বাবু। দে আর অল্ ফ্রেণ্ডস্।

বলে পর্দাটা তুলে ধরলো।

সুধীন দেখতে পেল একটা গোল টেবিল ঘিরে বসে জন পাঁচ সাত ছোকরা, আর সমান সংখ্যার ফিরিঙ্গি মেয়ে তাদের পিছনে, কেউ কাঁধে ভর দিয়ে, কেউ বা চেয়ারের হাতলে।

ওরা ঢুকতেই বুড়ির সঙ্গে একটি ছোকরার চোখে চোখে কি যেন কথা হ'ল। উঠে পড়লো সে। আর বুড়ি সেই চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললো সুধীনকে।

সুধীন পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিলো

লিজাকে।

লিজা ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। সুধীন চোখ ফিরিয়ে দেখলোও না। ও তখন তাস পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। জিততেই হবে, অনেক টাকা জিতে নিয়ে যেতে হবে সুধীনকে।

টাকা, টাকা। এই টাকার ওপর নির্ভর করছে একজনের জীবন। একজনের নয়, দু'জনের। ভগীরথ আর ভগীরথের বৌ।

কিন্তু, কিন্তু ঠিক আগের মতই জিতবে তো ও? মনের কোণে প্রশ্ন জাগলো সুধীনের। 'তুমি হারবে'। 'হেরে যাবে তুমি'। ডাক্তার সেনের কথাগুলো মনে পড়লো। কি আশ্চর্য্য, এমন অসময়ে এ-কথাগুলো মনে পড়লো কেন? কেমন যেন আতঙ্ক বোধ করলো সুধীন। মদের উগ্র গন্ধ, চুরুটের ধোঁয়া আর বন্ধঘরের গুমোট হাওয়ায় মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো ওর।

কে কি করছে, লিজা গেলাস হাতে পিছনে এসে যে দাঁড়িয়েছে এসব কিছুই দেখতে পেল না সুধীন। ওর চোখ শুধু টেবিলের ওপর।

একজন কে পটপট করে তাস বিলি করলো। একে একে টাকা জমা হতে সুরু করলো, চক্রাকারে হাত ঘুরে ঘুরে। তাস তুললো সকলেই, ফেললো একে একে। শুধুই দু'জন বাকী তখন। সুধীন আর অন্য একজন।

আরো দশটা টাকা ফেলে তাস দেখাতে বললো সুধীন, আর নিজের অজান্তেই টাকার স্তূপের দিকে হাত বাড়ালো।

প্রতিপক্ষ লজ্জিত হয়ে পড়লো যেন। জিতেছে, সুধীনই জিতেছে।

আবার তাস দিতে দিতে মনে মনে হাসলো সুধীন, ডাক্তার সেন বলেছিল, হারবে তুমি, হেরে যাবে। সব মিথ্যে। শক্তি হারায়নি সুধীন, সেই সুভগ গ্রহের দৃষ্টিটা এখনো আছে ওর ওপর।

পটপট: করে তাস বিছিয়েই তিরিশটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠলো ও। ও জানে, ও জিতবে। তবু অন্য লোকগুলো তাস ফেলে দিচ্ছে না দেখে ক্রমশই চটে উঠছিলো সুধীন।

ক্রমে ক্রমে সকলেই হাল ছেড়ে দিলো। আবার দু'জন। তাস তুললো সুধীন, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলো টেনে নিলো কোলের দিকে।

জিতেছে, সুধীনই জিতেছে।

আবার খেলা সুরু হ'ল। তাস পড়লো পর পর, আর টাকা। নোটের ওপর নোট জমা হয়ে উঠলো।

তাস তুললো। জিতেছে, সুধীনই জিতেছে এবারও।

অস্ফুট স্বরে আনন্দ প্রকাশ করলো লিজা। অন্য খেলোয়াড়দের বিষণ্ণ দেখালো। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলো, সুধীন জচ্চুরি করছে কিনা।

আবার খেলা সুরু হ'ল। মনে মনে হাসলো সুধীন, 'তুমি হারবে, হেরে যাবে তুমি' কথাটা মনে পড়লে'ত'ই। সব টাকা, সব টাকা জিতে নেবে ও। বাঁচাবে একটি প্রাণীকে। একটি নয়, দুটি। ভগীরথকে বাঁচাতে পারলে ভগীরথের বৌকেও বাঁচানো যাবে।

সামনের তাস তিনটে তুলে দেখতেও ইচ্ছে হ'ল না সুধীনের। সব টাকাগুলো বাজি রেখে সামনে ঠেলে দিলো ও। তারপর পাইপটা ধরিয়ে অপেক্ষা করলো।

ও জানে, ও জিতবে।

কিন্তু তাস তুলতেই হতাশা ফুটে উঠলো সুধীনের চোখে। একি! এ যে কল্পনাও করা যায় না। এ কেমন করে সম্ভব হয়?

প্রতিপক্ষ বুঝি আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একসঙ্গে উল্লাসের ধ্বনি তুললো। যেন পিয়ানোর সব কটি

চাবি চেপে ধরলো ওরা।

হেরে গেছে, হেরে গেছে সুধীন। সব টাকা হেরে গেছে।

হতাশ আর ক্লান্ত দেখালো সুধীনকে। লিজাও কেমন যেন আঘাত পেয়েছে মনে হ'ল, আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে ওরও।

হতাশার দীর্ঘশ্বাসে ভরা মন নিয়ে উঠে এলো সুধীন। লিজাকে বিদায় দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো কিছুক্ষণ। তারপর অন্ধকার ময়দানের ঘাসের জাজিমে এসে বসলো।

হেরে যাবে, হেরে যাবে তুমি। ডাক্তার সেনের কথাটা বারবার মনে পড়লো ওর। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি দুর্ব্বল মনে হ'ল।

ময়দানের ঠাণ্ডা অন্ধকারে বসে থেকে একসময় উঠে দাঁড়ালো সুধীন, পকেট হাতড়ে দেখলো খুচরো সামান্য কিছু পয়সা পড়ে আছে শুধু।

কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই যেন খুঁজে পাচ্ছে না। আর, আর রাণুকেই বা কি বলবে? দু'দিন আগে এই পরাজয়ের কথা শুনলে খুশি হয়ে উঠতো রাণু। ভাবতো, অভিশাপের বিষ ঘুচে গেছে সুধীনের রক্ত থেকে। কিন্তু, কিন্তু যে চিরকাল ওকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে, অনুরোধ করেছে তাস থেকে দূরে থাকতে, সেই রাণুই যে আজ ওকে শক্তি পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিল। হয়তো আশায় আশায় বসে আছে। ভাবছে, কত টাকা নিয়ে ফিরবে সুধীন। স্বপ্ন বুনছে হয়তো, সেই টাকায় ভগীরথকে বাঁচানো যাবে, বাঁচানো যাবে ভগীরথের বৌকে।

আনমনে নিরুদ্দেশ ঘুরতে ঘুরতে সুধীন হঠাৎ আবিষ্কার করলো

উকীলের বাড়ীর সামনে এসে গেছে কখন ও।

ভালই হয়েছে। সব কথা খুলে বলবে সুধীন, বলবে, সব টাকা হেরে গেছে ও। টাকা নেই, টাকা দিতে পারবে না।

বললোও তাই। একে একে সব ঘটনাটা বলে সুধীন জানালো, ভগীরথকে বাঁচাতেই হবে, যেমন করে হোক ওকে বাঁচান আপনি।

তারপর ভগীরথের বৌয়ের সেই অবিরাম কান্না আর অসুস্থতার কথা বললো।

নাম করা উকীল সিন্‌হা সাহেব। নাম তাঁর শুধু অর্থলোভের জন্যেই নয়, উঁচুহারের ফী নেয়ার জন্যেও।

ভগীরথের মামলার কাগজপত্তরের ওপর একাগ্র মনে চোখ-বোলাতে বোলাতে সিন্‌হা সাহেব বললেন, দয়া? দয়া করে বিনা ফীতে মামলা লড়তে হবে?

সুধীন শুষ্ক হাসি হেসে বললে, আমার তো কেউই নয় ও, নীচে তলার বাসিন্দে, এই সম্পর্ক। কিন্তু বৌটি তার অমন সরল সুন্দর একটি মেয়ে, স্বামীর জন্যে যে এতখানি কষ্ট স্বীকার করছে, ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেছে টি বি রুগীর মত, তাকে বাঁচাবার জন্যে, যদি চান তো আমার নিজেরই জমি-জমা বিক্রী করে টাকা দোব। কিন্তু ওকে বাঁচাতেই হবে, যেমন করে হোক্।

সিন্‌হা সাহেব পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে মুখ তুলে তাকালেন সুধীনের মুখের দিকে।

বললেন, দয়া মায়া থাকলে ওকালতি করতে আসতাম না, বুঝলেন? কিন্তু টাকা না পেলেও এ মামলা আমি লড়বো। এত ইণ্টারেসৃটিং কেস আমি জীবনে দেখিনি। শুধু নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্যেই ভগীরথকে ফাঁসীকাঠ থেকে বাঁচিয়ে আনবো আমি।

আশায় উৎকণ্ঠায় ব্যগ্র হয়ে সুধীন প্রশ্ন করলো, সত্যি বাঁচাতে পারবেন ওকে ?

সিন্‌হা সাহেব হাসলেন।—বাঁচাতে পারবো বিশ্বাস আছে বলেই এমন খুনী লম্পটের মামলা হাতে নিয়েছি। ভগীরথ ব্যাটাকে বাঁচাবার জন্যে নয়, নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্যেই এ মামলা চালাবো আমি। আর, আর জেনে রাখুন, আমি যখন হাত দিয়েছি তখন আর যাই হোক্ ফাঁসী হবে না ওর।

প্রথম যেদিন সুরজিতের সঙ্গে আলাপ হ'ল ইন্দিরার, সেদিন রাণুমামীমার সঙ্গে সুরজিৎও যখন বিদায় নিলো তখন দু'জনের মধ্যে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে চোখোচোখি হয়েছিল। পরস্পরের চোখ হয়তো বলেছিল যে অপরজন তাকে মুগ্ধ করেছে, শান্ত জীবনের স্রোতে লঘুতরঙ্গের রেশ ফুটিয়ে গেছে।

কিন্তু মনের রঙ কতদিন আর উজ্জ্বল থাকে! ইন্দিরা হয়তো ভুলেই যেতো। পড়াশুনো, বন্ধুবান্ধব, হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে ছুটে চলার জীবন ওর। স্তব্ধ হয়ে নির্জ্জনে বসে মধুমুহূর্ত্তের রোমন্থন ওর সয় না এতটুকু। দিনে দিনে তাই সুরজিতের স্মৃতিটুকু ধুয়ে যাচ্ছিল ইন্দিরার মন থেকে।

এমন সময় হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল।

পাড়ায় ছিল একটা নামকরা বড়োসড়ো লাইব্রেরী। আর এই লাইব্ররীতে প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ইন্দিরা যেত বই বদলে আনতে। জানতো না, সুরজিৎও ঠিক ওর মতই মাঝে মাঝে বই বদলাতে আসে ঐ একই লাইব্রেরীতে।

সামান্য দু'চার মিনিটের পার্থক্যের জন্যে কোনদিনই দেখা হ'ত না ওদের। ইন্দিরা আসতো, তাড়াতাড়ি বইটা বদলে নিয়েই সরে পড়তো আশেপাশের আর পাঁচজনের উৎসুক দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে। আর সুরজিৎও এসে দু'একটা পত্রিকার পাতা উল্টেই বই নিয়ে চলে যেতো।

সেদিনও সুরজিৎ যথারীতি বইটা টেবিলে রেখে অন্য কি বই নেবে ভাবছিল। আশেপাশে ছোট-খাটো একটা ভিড় দাঁড়িয়ে ছিল বই বদলাবার জন্যে। এমন সময় পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক একটি বই ফেরৎ দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালো সুরজিৎ।

এতদিন এই বইটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো ও। তাই বইটা দেখতে পেয়েই হাত বাড়িয়ে বললে, এটা আমি নোব।

কিন্তু তার আগেই ওর পিছন থেকে আর একখানা হাত ছোঁ মেরে তুলে নিলো বইটা। বললে, এই তো ফিরেছে, দিন আমাকে।

সুরজিৎ শুধু দেখতে পেলো ওর পিছন থেকে একখানা নরম হাত, গোটা তিনেক সরু সরু সোণার চুড়ি সে হাতে, এগিয়ে এলো ওর পিছন থেকে, কাণের পাশ দিয়ে। কাঁধে পিঠে এক টুকরো নরম স্পর্শ অনুভব করলো সুরজিৎ। আর কাণের পাশে উষ্ণ নিশ্বাস। হাল্কা সেণ্টের এক বাতাস সুগন্ধ।

ফিরে তাকালো সুরজিৎ।

ইন্দিরাও এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি সুরজিৎকে।

দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, আপনি!

তারপর ইন্দিরাই বইটা নিলো, বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, নিন বইটা, আপনার পড়া হ'লে দিয়ে আসবেন আমাকে।

—তা কি করে হয়। হাসলো সুরজিৎ। আপনি নিয়েছেন যখন আগে আপনি পড়ুন, তারপর আমি নিয়ে আসবো একদিন।

ইন্দিরাও হেসে বললে, বেশ, তাই হবে।

লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এসে ইন্দিরা বললে, তারপর রাণুমামীমার কি খবর? আর তো কৈ এলেন না।

সুরজিৎ বললে, সেদিন তো কথা হ'ল আপনিই যাবেন। তাই

রাগ করে হয়তো আর আপনার কথাও বলেন না আজকাল। আগে তো সবসময় কেবল আপনার কথাই বলতেন।

—ওমা, সত্যি রাগ করেছেন নাকি! বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললো ইন্দিরা।—ছি ছি, সত্যি বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। বলবেন, যাবো, নিশ্চয় যাবো একদিন, এই সপ্তাহেই।

সুরজিৎ হেসে বললে, আজই চলুন না, একই পাড়ায় থাকেন, পাঁচ দশ মিনিটের রাস্তা, অথচ যান নি এতদিন, অন্যায় তো হয়েছেই আপনার।

ইন্দিরাও কেমন দুঃখিত বোধ করলো, বললে, না না, আজ না। আরেক দিন যাবো, বলবেন।

সুরজিৎ হেসে বললে, বাড়ী ফেরার তাড়া আছে বুঝি?

—না, এমনি।

সুরজিৎ মনের কথাটা যেন কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছে না। আমতা আমতা করে বললে চলুন না কোথাও গিয়ে বসি।

কৌতুকের হাসিটা লুকিয়ে ফেললো ইন্দিরা।

বললে, বেশ তো, কোথায় যাবেন বলুন।

—পার্কে!

চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে হাত নেড়ে ইন্দিরা বললে, না না। লোকগুলো সব তাকিয়ে থাকবে ড্যাব ড্যাব করে, ছেলেগুলো জ্বালাবে, ওখানে আমি যাচ্ছি না।

সুরজিৎও হেসে ফেললো ওর ভাবভঙ্গি দেখে।

ইন্দিরার চোখে মুখে দুষ্টুমি কাঁপলো। বললে, বরং আপনাদের বাড়ী যাই চলুন। আলাপও হবে সকলের সঙ্গে, আর বইটা পড়া হ'লে দিয়ে আসতেও পারবো।

কথাটা বলেই সুরজিতের মুখের দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো ইন্দিরা। অর্থাৎ বিব্রত বোধ করে কি না সুরজিৎ।

বাঙালী ঘরের খবর তো ইন্দিরা নিজেও রাখে। জানে। আর এইটুকু জীবনেই ও বুঝে নিয়েছে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে সবসময়েই দু'পা এগিয়ে আসতে চায় অথচ তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় তাদের, সাপ দেখেই যেন ভয়ে পাঁচ পা পিছিয়ে যায় তখন।

কিন্তু সুরজিৎ বিব্রত তো হ'লই না, উল্টে খুশি হয়ে বলে উঠলো, যাবেন? সত্যি যাবেন আমাদের বাড়ী? চলুন। মা এত খুশি হবে।

যদিও ঠাট্টার সুরেই কথাটা বলতে চেয়েছিল ইন্দিরা, তবু সুরজিতের উৎসাহে ফুঁ দিতে ইচ্ছে হ'ল না ওর। বললে,যাবো না কেন, যেতেই তো চাইছি।

আর পথ চলতে চলতে ইন্দিরার মনে নানা কল্পনা জাগলো, যা সুরজিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরও কোনদিন সে ভাবে নি। কেমন বাড়ী, কি ধরনের পরিবার, সুরজিতের মা কেমন এমনি আজেবাজে কথা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়ীটার সামনে এসে পৌঁছলো ইন্দিরা তখন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলো ও।

কিন্তু সুরজিতের মা'র সঙ্গে আলাপ হতেই ইন্দিরার মনে হ'ল যেন কতদিনের পরিচিত।

পরিচয়টা শুনেই সুরজিতের মা বললেন, এত রাণুবৌদি রাণুবৌদি করিস্ তাকেও ধরে আনতে পারলি নে?

সুরজিৎ হেসে বললে, তাঁকে পাবো কোথায় মা! ওঁর সঙ্গে লাইব্রেরীতে দেখা হয়ে গেল। তাই নিয়ে এলাম।

ইন্দিরা অম্‌নি চোখে ভর্ৎসনা ছুঁড়লো।—এই, মিছে কথা বলবেন

না বলছি।...না মাসীমা, আমি নিজেই বললাম, চলুন আপনাদের বাড়ী যাবো।

সুরজিতের মা হেসে বললেন, বেশ করেছো মা। ও যে নিয়ে আসেনি তা আমি জানি। দেখো না, দিনরাত রাণুবৌদি রাণুবৌদি করবে, কত গল্প তার, অথচ এত করে বলি একটা দিন নিয়ে আসার নাম করে না।

ইন্দিরা হেসে উঠে বললে, ওমা আমার তো ধারণা ছিল রাণু মামীমা বুঝি আপনাদের বাড়ী রোজ আসেন, আমাদের বাড়ীতেই যান না।

সুরজিতের মা হাসলেন।—সুধীন যখন ডাক্তারি পড়ছে, তখন আসতো, আমার তৈরী পিঠে পাটিসাপটা খাবার জন্যে। সে কি রাগারাগি। একদিন গুণে গুণে ষাটটা পাটিসাপটা খেয়েছিল, জানো? বলেই হেসে ফেললেন। ইন্দিরা আর সুরজিৎও হেসে উঠলো।

ইন্দিরা বললে, তা হ'লে নিশ্চই খুব ভালো পাটিসাপটা বানাতে জানেন আপনি। আমিও এসে খেয়ে যাবো একদিন।

—তা এসো, আসবেই তো। কিন্তু সে শরীর কি আছে মা, যে খেটেখুটে করবো, না কি তেমন জিসিষপত্তরই পাওয়া যায় আজকাল।

সুরজিৎ বললে, না পাওয়া আবার যায় না। সবই পাওয়া যায়। আর তুমি না পারো উমাকে ব'লো, ও করবে, তুমি দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ ওঁকে চা-টা দেবে না? ওঁদের বাড়ীতে গেলেই কিন্তু টায়ের ব্যবস্থা হয়।

ইন্দিরার মুখের দিকে তাকালো সুরজিৎ, আর দু'জনেই হাসলো সেই পুরোনো কথাটা মনে পড়ে। 'আপনারা চায়ের সঙ্গে জল খান বুঝি?' সুধীন প্রশ্ন করেছিল প্রথম দিন, ইন্দিরা চা-টা ব্যবস্থা করে

আসি বলে দু'গ্লাস জল নিয়ে ঢুকতে। ইন্দিরা উত্তর দিয়েছিল, টায়ের সঙ্গে খাই।

—হ্যাঁ যাই। বসো তোমরা। বলে চলে যাচ্ছিলেন সুরজিতের মা।

সুরজিৎ বললে, উমাকে পাঠিয়ে দিও।

মা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, যা না তোরা, সে একা একা সেই যে পুং পুং না কি করেছিস তাই খেলছে।

সুরজিৎ হো হো করে হেসে উঠলো।—আবার পুং পুং বলছো। পিং পং, পুং পুং নয়।

মা হেসে বললেন, ঐ একই। বলে চলে গেলেন।

সুরজিৎ বললে, চলুন আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করবেন। টেবল্ টেনিস খেলতে জানেন আপনি? জানেন নিশ্চয়ই।

—না। একটুও জানি না।

সুরজিৎ বললে, চলুন শিখিয়ে দোব।

ইন্দিরা ভেবেছিল রীতিমত একটা টেবল্ টেনিসের ব্যবস্থা দেখবে। কিন্তু ঘরে ঢুকে হাসি চাপলো ও। একটা কাঠের তক্তপোষ বোধহয় রাতে চাকরবাকর কেউ শোয়, তারই বিছানা তুলে দিয়ে চার পায়ে তিনটে করে ইঁট দিয়ে উঁচু করা হয়েছে, আর মাঝ বরাবর একটা ব্যাডমিণ্টনের নেট দু'ভাঁজ করে লাগানো। শুধু বলটাই টেবল্ টেনিসের। আর ব্যাট দুটোর একটার আবার একদিকের রবারটা উঠে গেছে।

সেই র‍্যাকেটেই বলটা দেয়ালে ঠুকে ঠুকে খেলছিল উমা। ওদের ঢুকতে দেখেই থেমে পড়ে সবিস্ময়ে তাকালো ইন্দিরার দিকে।

সুরজিৎ আলাপ করিয়ে দেবার পর ইন্দিরা যেই মুহূর্ত্তের জন্যে অন্যদিকে তাকালো অমনি উমা চোখ বড়ো বড়ো করে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে মাথাটা বার তিনেক ওপরে থেকে নীচে, নীচে থেকে

ওপরে দোলালো। অর্থাৎ 'সব বুঝিয়াছি!'

সুরজিৎ চোখের ধমক দিয়ে বললে, দে ব্যাট দে, আমরা খেলবো।

ইন্দিরা হেসে বললে, না, না, আমি একটুও খেলতে জানি না।

সুরজিৎ বললে, শিখিয়ে দিচ্ছি ভয় কিসের। আপনার বুঝি ধারণা, উমাটা ভাল খেলে? মোটেই না। ব্যাট ধরতেই জানে না ও।

উমা রেগে গেল।—কাল হেরে গেছো মনে নেই বুঝি?

ওর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো সুরজিৎ।—আমি বাঁ হাতে আর উনি ডান হাতে, তাও মাত্র দু'পয়েন্টের জন্যে হেরেছি। তাতেই গর্ব্বে নাক ফুলে গেছে।

ইন্দিরাও খিলখিল করে হেসে উঠলো।—গর্ব্বে নাক ফুলে যায় নাকি?

সুরজিৎ উত্তর দিলো না, ব্যাটটা ইন্দিরাকে দিয়ে কি ভাবে ধরতে হবে দেখিয়ে দিলো। আর সেই অজুহাতেই যেন ইন্দিরার হাত স্পর্শ করলো সুধীন। সামান্য একটু স্পর্শ, তাও ক্ষণিকের, তবু যেন রোমাঞ্চের শিহরণ অনুভব করলো সুধীন।

আর অসীম ধৈর্য্যে খেলা শেখাতে সুরু করলো।

ইন্দিরা যত না খেললো তার চেয়ে বেশি নিজের অপটুতায় নিজেই হাসলো। বলটা লক্ষ্য করে ব্যাট চালাতে গিয়ে কখনো তা তক্তপোষে লাগে খটাং করে, কখনো বা বল্‌টা ডান দিকে মারতে যায় তো বাঁ দিকের দেয়ালে গিয়ে লাগে। আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে ওঠে ইন্দিরা।

কিন্তু সুরজিৎ প্রশংসা করে। বলে, প্রথম দিনের পক্ষে তো ভালই খেলছেন। উমা তো এখনো আপনার মতই ভুল করে।

উমাও মাঝে মাঝে উৎসাহ দেয়।

এমনি ভাবে খেলা চলতে চলতে এক সময় মা এসে হাজির হ'ন। দুটি রেকাবীতে ডিম ভাজা রসচিড়ে নিয়ে।

এই ধরনের ডিম আর চিড়ে মেশানো খাবারটা ইন্দিরার কাছে একেবারে নতুন।

বিদায় নেবার সময় তাই মা যখন আবার আসতে বললেন, ইন্দিরা হেসে বললে, সেদিনও আবার এমনি এক থালা চিড়ে-ডিম পাবো তো?

মা হেসে বললেন, যেদিন আসবে!

খবরটা একেবারে চেপে রাখা হয়েছিল।

সকাল থেকেই ভগীরথের বৌয়ের জরটা ছেড়ে গিয়েছিল। তবু রুগ্ন দুর্ব্বলতায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলো না।

এদিকে সেইদিনই মামলায় রায় বেরুবার কথা।

সুধীনের পরামর্শে রাণু সে-খবর একেবারে চেপে গিয়েছিল। অসুস্থ শরীরে এ-খবর শুনলে হয়তো আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। হয়তো বা অধৈর্য্য হয়ে উঠতে পারে রায় জানবার জন্যে। তাছাড়া কোর্ট পর্য্যন্ত যেতে চাইবে হয়তো, আর যদি ফাঁসীর হুকুম দেয় তা হ'লে···। এই সব ভেবেই খবরটা ভগীরথের বৌকে জানানো হয়নি।

প্রতিদিনের মতই সেদিনও ভগীরথের বৌয়ের রোগশয্যার পাশে এসে বসলো রাণু।

ভগীরথের বৌ প্রশ্ন করলো, ওর কি খবর দিদি?

—মামলা চলছে। উকীল তো ভরসা দিয়েছে।

—ফাঁসীতে মৃত্যু হ'লে সে বড়ো কষ্ট, না দিদি?

রাণু বললে, ওসব কেন ভাবছো ভাই, উনি ছাড়া পাবেন।

—তাই যেন হয় দিদি। আমার মন বলছে, ও নিরপরাধী। ও কখেনা এমন কাজ করতে পারে না। আমি তো জানি, মেয়েদের দিকে উনি কখনো চোখ তুলে তাকাতে পারেন না। আর অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকলে আমি জানতে পারবো

না এও কি হয়, বলুন আপনি ?

রাণু এ-কথার কোন উত্তর দিলোনা, চুপ করে রইলো।

ভগীরথের বৌ বললে, ও যে জানে, চরিত্রহীন লোক আমার দু'চক্ষের বিষ। পুরুষমানুষের সব দোষ আমি ক্ষমা করতে পারি দিদি, কিন্তু চরিত্রহীন আমার কাছে বিষ। ও কখনো এমন কাজ করতে পারে না। তা ছাড়াঃ হেসে উঠলো ভগীরথের বৌ, বললে, ও কিনা খুন করবে? আমার হাত কেটে রক্ত পড়তে দেখে এক বার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, আর ও করবে খুন? অবিশ্বাসে হাসলো আবার।

রাণু সান্ত্বনা দিলো, উকীলও বলেছে, প্রমাণ নেই ভালো। বড়ো জোর দু'একবছরের জেল হতে পারে, ফাঁসী কিছুতেই নয়। তুমি আর ভয় পেও না ভাই, উনি ঠিক ফিরে আসবেন।

ভগীরথের বৌ চোখ মুছে বললে, তাই যেন আসেন দিদি।

ভগীরথের বৌকে সান্ত্বনা দিয়েই ফিরে এলো রাণু। সুধীন তখন পোষাক পরে তৈরী হয়ে আছে।

রাণু বললে, আমাকে নিয়ে যাবে ?

—না, যেও না।

—কেন ?

সুধীন বিষন্ন গলায় বললে, কি রায় দেবে তার তো ঠিক নেই। শেষে রায় শুনে হয়তো কোর্টে ই অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

রাণু বললে, না, যাবো আমি। মনের জোর অত কম নয় আমার।

শেষ পর্য্যন্ত রাণুকে নিয়ে যেতে হ'ল সঙ্গে।

গাড়ী থেকে নেমেই রাণুর চোখ গেল ফটকের একপাশে বটগাছটার তলায়। বটের গোড়ায় সিঁদুর মাখানো কি একটা মূর্ত্তি। ঠিক্

চিনতে পারলো না রাণু। একরাশ ছোটবড়ো পাথর, ফুল পাতা সিঁদুরের রাশ, কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি…এ দৃশ্য-পটে আরো অনেকবার চোখ পড়েছে সুধীনের, কিন্তু কোনদিনই কাছে গিয়ে দেখে নি।

গাড়ী থেকে নামতেই কিন্তু রাণুর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঐ দিকে। জিগ্যেস করলো, কি ঠাকুর বলোতো ?

সুধীন সেদিকে তাকিয়ে হাসলো।—কি জানি।

রাণু এগিয়ে গেল সেদিকে। কালো গায়ে সাদা পৈতে ঝোলানো। কোন প্রশ্ন করতে হ'ল না। রাণু কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, 'আদালত ঠাকুরের' পূজো দিয়ে যান মা, মামলায় নির্ঘাৎ জিৎবেন। না দিলে আদালত বাবা রেগে যাবেন।

—আদালত বাবা ? সবিস্ময়ে তাকালো রাণু পুরুতের মুখের দিকে।

উত্তর এলো, হুঁ মা। একেবারে জাগ্রত দেবতা। বাবার পূজো দিলে তালাক চাইলে তালাক হয়, মদমাতালও জামিন পায়, কালাপানি বন্ধ হয়, খুনী আসামীর মাত্র চারবছরের জেল হয়।

রাণু ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলো, কত পূজো দিতে হয় ?

পুরুত ঠাকুর উত্তর দিলো, যা খুশি। ছোট মামলায় পাঁচ আনা, জরিমানা দিতে হয় না তা হ'লে। আর জেলের কয়েদী হ'লে পাঁচ শিকে, ফোর টোয়েন্টি অর্থাৎ জালজচ্চুরির আসামী হ'লে পাঁচ টাকা, আর যদি খুনী আসামী হয় তো দশ টাকা।

রাণু বিস্মিত হয়ে শুনছিলো কথাগুলো। আর তারই ফাঁকে দু'চারজন করে লোক এসে পূজো দিয়ে যাচ্ছিল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে তাদের হাতে ফুল বেলপাতা তুলে দিচ্ছিলো পুরুত ঠাকুর।

সুধীনের কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে পিতলের রেকাবীটায় রাখলো রাণু। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলো আদালত বাবাকে।

পুরুতঠাকুর এবার মন্ত্র আওড়ালো মিনিট পাঁচেক ধরে। তার পর ফুল বেলপাতার আশীর্ব্বাদ রাণুর মাথায় ঠেকিয়ে হাতে তুলে দিলো। বললে, বাবা খুশি হয়েছেন, আসামীর ফাঁসী বাঁচবে।

শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে রাণু পুরুতঠাকুরকেও প্রণাম করলো। আর কোটে ঢুকতে ঢুকতে বললে, দেখলে ? কি করে জানলেন উনি, খুনী আসামীর জন্যে এসেছি আমরা।

সুধীন হেসে বললে, দশটা টাকা দেখেই।

—বাঃ রে, খুনী না হয়ে অন্য কোন বড়ো মামলাও তো হতে পারতো।

—অন্য মামলা হ'লে তুমি জিগ্যেস করে নিতে কত পূজো দিতে হবে, সেটুকু জ্ঞান ওর আছে।

রাণু কপট ক্রোধে বললে, তোমার সবতাতেই অবিশ্বাস।

সুধীন উত্তর দিলো না।

আদালত কথাটাই শুনে এসেছে রাণু এতদিন। ভগীরথের মামলার তদারকে সুধীনের ঘোরাঘুরি দুশ্চিন্তা দেখেই ও বুঝেছিল কেন নির্ব্বংশে হবার অভিশাপ না দিয়ে ঘরে মামলা ঢোকার অভিশাপ দেয় শত্রুতা করে।

কোর্টঘর বলতে কি বোঝায় দেখতে পেল রাণু।

লোহার গ্যেট পার হয়েই মাছের বাজারের মত ভিড়। ডান দিকে একসারি পানের দোকান, তারপর একটা ছোট্ট ঘর, সে-ঘরে জনকয়েক টাইপিস্ট অবিরাম খটাখট খটাখট টাইপ করে চলেছে, তারও পরে গোটা তিনেক চায়ের দোকান। আর বাঁ দিকে একরাশ

কালোকোট পরা উকীল তীর্থের কাকের মত মক্কেলের পিছনে পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে পুলিশ কনেস্টবল হয়তো বা কোমরে দড়ি বাঁধা আসামীকে নিয়ে চলেছে হাজতের দিকে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে, সরু সিঁড়ি বেয়ে, দেয়ালের নোংরা দাগ, পানের পিচ ইত্যাদি থেকে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তেতলায় উঠে এলো ওরা। আদালত তো নয়, অন্ধকূপ যেন। কোথাও এতটুকু আলো বাতাস নেই। আর চতুর্দ্দিকে ভিড়ের ঠেলাঠেলি। উকীল, আসামী, পুলিশ সব যেন গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে। তেতলায় একটা মান্ধাতা আমলে বেঞ্চি, তাতে একটু ফাঁক পেয়েছে কি অমনি একজন এসে বসবে। আসামী থেকে স্বরু করে সকলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনও ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে ঠেস দিচ্ছে, বসবার জায়গা নেই এতটুকু।

কোর্টঘরগুলোতেও লোক গিসগিস করছে। বেঞ্চি খালি নেই একটা। বিরক্ত হয়ে রাণু এসে অপেক্ষা করলো এক জায়গায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। স্বধীন চলে গেল বড়ো উকীল সিনহা সাহেবের খোঁজে। সহকারী উকীলবাবু ব্যস্ততা দেখালো, এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট কিনতে বললে স্বধীনকে, সিন্‌হা সাহেবের উদ্দেশে মন্তব্য করলো, ইরেসপনসিব্‌ল! তারপর কখন অন্য এক মক্কেলের কাছ থেকে কিছু বাগাবার জন্যে উধাও হয়ে গেল।

রাণু যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে নীচের হাজত ঘরটা দেখা যায়। চতুর্দ্দিক জাল দিয়ে ঘেরা অন্ধকূপ। অনেক নীচে, উঁকি দিয়ে দেখলো, একরাশ লোক নোংরা পোষাকে জটলা পাকিয়ে রয়েছে। একটা দিক জলে ভাসছে ঘরটার। আর সেখান থেকেই দুর্গন্ধ ভেসে আসছে কদর্য্য একটা। মানুষগুলোকে রাখা হয়েছে খোঁয়াড়ের গরু

ছাগলের মত। এই জটলা পাকিয়ে বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে ভগীরথ কোথাও বসে আছে কিনা বুঝতে পারলো না রাণু।

ইতিমধ্যে সুধীন ফিরে এলো।

—বললে, চলো। আঠারো নম্বর ঘর খালি হবে এখনই সেখানে গিয়ে বসবে।

ঘণ্টা তিনেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল রাণুর। শেষ পর্য্যন্ত মেঝেতেই বসে পড়বে কিনা ভাবছিল।

আঠারো নম্বর ঘরের সামনে আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ঘর খালি হ'ল। বসতে পেল রাণু।

বেঞ্চির ওপর পা তুলে দিয়ে খালি ঘরটায় বসলো সুধীন। বললে, উকীলবাবুটিকে দেখে উকীলদের যতখানি ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয় সিন্‌হা সাহেবকে দেখে কিন্তু তা মনে হবে না। গিয়ে দেখি তন্ময় হয়ে কাগজপত্র দেখছেন ভদ্রলোক। যদি কিছু হয় ভগীরথের, জেল-টেল, তা হ'লে যাতে সঙ্গে সঙ্গে আপীলের দরখাস্ত দেয়া হয় তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

রাণু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে, কি হবে মনে হয়, বললেন উনি?

—বললেন, এটা হ'ল পুলিশের রাজত্ব। পুলিশ কানে কানে যা রায় দিতে বলে তাই হয়। বিচার হয় হাইকোর্টে।

রাণু অবিশ্বাসের সুরে বললে, তাই কখনো হয়। ও কথা উকীলরা দোষ ঢাকবার জন্যে বলে। এখান থেকেও তো লোকে ছাড়া পায়।

—বললেন, তাও নাকি ধরাধরি করে কিংবা টাকার জোরে। আর নয় তো বড়ো উকীল ব্যারিস্টারের ভয়ে।

রাণু অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।—তাই কখনো হয়!

সুধীন কি যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই উকীলবাবুটি এসে

হাজির।—চলুন মশাই, সাত নম্বরে। মামলা উঠবে এখনি।

সুতরাং সাত নম্বরে এসে পিছনের বেঞ্চিতে বসলো ওরা।

উকীলবাবু বিদ্রূপের স্বরে বললে, কৈ মশাই আপনার ব্যারিস্টার সাহেব? যত সব ইরেসপনসিব্‌ল্‌, রায় বেরুবে এখনি, পাত্তা নেই তাঁর।

সুধীন বললে ঠিক, সময়ে আসবেন বলেছেন।

—আসবেন! হাসলো উকীলবাবু।

কিন্তু সত্যি ঠিক্ সময়েই এলেন সিন্‌হা সাহেব।

ভগীরথকেও হাজির করা হ'ল জালে ঘেরা কোর্টরুমের একপাশের জালে ঘেরা ঘরটায়। হাতে তার হাতকড়া।

রাণু দেখলো ভগীরথের মুখেচোখে তখনও একগুঁয়েমির ভাব। বিচারকের আসনটার দিকে তাকিয়ে দর্শকদের দিকে চোখ ফেরালো ভগীরথ। বোধহয় নিজের স্ত্রীকে খুঁজলো। তারপর রাণুর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই লজ্জায় মুখ নামালো ভগীরথ।

রায় সুরু হ'ল। দীর্ঘ তিরিশ পৃষ্ঠার রায় পড়ে যেতে লাগলেন বিচারক। কিন্তু মূল কথাটা কিছুতেই যেন বলছেন তা। সমস্ত মামলার বিবরণটাই যেন পড়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ জুড়িদের বোঝাচ্ছেন মামলার গুরুত্ব।

সুধীন আর রাণু দু'জনেই অধৈর্য্য হয়ে উঠছিল। আর ভগীরথের মুখও অস্বস্তিতে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল।

সব শুনে জুরিরা বিদায় নিলেন আলোচনার জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো কোর্টসুদ্ধ দর্শক। জাল ঘরের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে ভগীরথ। ডাক্তারের খোঁজই করা হ'ল, এসে পৌঁছলো না। কনেস্টবলটাই মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো ভগীরথের।

রাণু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমার মাথা ঘুরছে, চলো বাড়ী যাবো আমি।

সুধীন হাত ধরে বসতে বললে রাণুকে।—রায়টা শুনে যাই, বসো।

ঘণ্টাখানেক পরে জুরিরা ফিরে এলো। রায় বেরুলো।

আসামীর অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে নি। সন্দেহের অবকাশে তাকে মুক্তি দেয়াই উচিত।

আনন্দে খুশিতে সুধীনের হাতটা চেপে ধরলো রাণু।

সুধীনও খুশি হয়ে উঠলো।

কিন্তু পরক্ষণেই ও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো।

—সে কি? ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না? দেখা করবে না?

গুরুগম্ভীর স্বরে সুধীন উত্তর দিলো।—না।

ইন্দিরা আর সুরজিৎ। ক্রমশ দু'জনে দু'জনের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। প্রায়ই রাস্তায় কলেজ থেকে ফেরার পথে, কখনো বা পাড়ার লাইব্রেরীতে দেখা হয়ে যেত। দু'জনেরই সন্দেহ হ'ত সাক্ষাৎটা আকস্মিক মনে হ'লেও আকস্মিক নয়। যেন অন্য পক্ষও এর জন্যে তৈরী হয়েই ছিল।

কোন কোনদিন অবশ্য সুরজিৎ গিয়ে হাজির হ'ত ইন্দিরাদের বাড়ী, কখনো ইন্দিরাই বই দেবার অজুহাতে সুরজিতদের বাড়ী যেত। কিন্তু মনে মনে ইন্দিরাও অনুভব করতো যে সুরজিতের ওপর কি এক অবোধ্য দুর্ব্বলতা তার। একটা দিন দেখা না হ'লেই কেমন যেন অস্বস্তিতে কাটতো তার সারা সন্ধ্যা, সারা রাত। কখনো কখনো কোন রাস্তার ধারে, কিংবা পার্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো। আর তারই ফাঁকে কি ভাবে যে ওরা পরস্পরের কাছে সম্বোধনের ঘনিষ্ঠতায় নেমে এসেছে তা বুঝতে পারে নি।

শুধু তাই নয়, ওরা দু'জন যে পরস্পরকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালবাসতে সুরু করেছে তা মুখ ফুটে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় নি কোনদিন। চোখের ভাষা, হাবে ভাবে, অন্তরঙ্গ বিদ্রূপ আর হাসা-হাসির মধ্যেই তা বলা হয়ে গেছে, বলা হয়ে গেছে হাতের উষ্ণ স্পর্শে।

শুধু একটি কথাই ওরা বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলতে পারছিলো না সে কথা।

ইন্দিরা শুধু একদিন জিগ্যেস করলো, তারপর ? পড়াশুনো তো শেষ করলে, এবার ? কি করবে প্রফেসরি ?

—না। হাসলো সুরজিৎ। বললে, চাষ করবো আমি।

—চাষ ? গ্রামে গিয়ে ? খিলখিল করে হেসে উঠলো ইন্দিরা। —না বাপু, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবো না আমি। কাদা প্যাঁক প্যাঁক রাস্তাঘাট দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

সুরজিৎ বললে, বেশ তো, তুমি কোন শহুরে প্রফেসরেরই ঘর করো। আমি কিন্তু চাষ করবো।

—ও বুঝেছি। তোমার সুধীনদাটির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাও, না ?

সুরজিৎ বললে, না। লাঙলের চাষ নয়। আমি হাজার বিঘে জমি লীজ নেবো, ট্রাকটার কিনবো, গ্রামকে ভেঙ্গে একেবারে শহর বানিয়ে দেবো।

ইন্দিরা অবিশ্বাসের হাসি হাসলো শুধু। ভাবলো, এ শুধুই সুরজিতের উচ্ছ্বাস। সারা জীবন শহরে কাটিয়ে কেউ কি সত্যিই গ্রামে যেতে চায় ? কিন্তু সুরজিৎ যে রসিকতা করে নি বুঝতে পারলো রাণুর কাছ থেকে।

—শুনেছো ইন্দিরা ? গল্প করতে করতে এক ফাঁকে রাণু বললে, সুরজিৎ যে আমাদের গ্রামে চললো, যন্ত্রপাতি কিনে চাষ করবে বলে।

—সে কি ! বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো ইন্দিরা।

রাণু হেসে বললে, হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। আমাদের সব জমিজমা ও মটোরের লাঙল দিয়ে নাকি চাষ করবে।

ইন্দিরা কোন কথা বললে না।

রাণু জিগ্যেস করলো, গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে তো ?

—আমি কেন থাকতে যাবো !

—বাঃ রে। কিছুই জানি না নাকি আমরা। তোমার মা'র সঙ্গেও তো কথা হয়ে গেছে আমার। বিয়েতে কোন আপত্তি নেই বলেছেন। তোমার বাবাও নাকি বলেছেন, তোমার ইচ্ছেতেই বিয়ে হবে।

ইন্দিরা লজ্জায় মাথা নীচু করলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, না আমি পাড়াগাঁয়ের লোককে বিয়ে করতে পারবো না।

কথাটা এমন সুরে বললো, যেন বলতে চায়, ঠিক উল্টো কথাটাই।

রাত অনেক তখন। পাড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আলো নিভে গেছে সব ক'টা জানালার। হৈ হল্লা কথাবার্ত্তাও চুপ হয়ে গেছে। শুধু গলির ওপারের কোন একটা বাড়ীতে হয়তো বাসন মাজছে ঝিটা, তারই শব্দ আসছে থেকে থেকে।

সুধীন আর রাণুও শুয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর। কিন্তু ঘুমোতে পারছিল না। সত্যি তো, কোথায় গেল ভগীরথ? ফিরলো না কেন এখনো?

রাণু অনুযোগ করলো, এত করলে ওর জন্যে, সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত বাপু?

সুধীন কোন উত্তর দিলো না, পাশ ফিরে শুলো, হয়তো বিরক্তিতেই।

রাণু তবু বললে, লজ্জায় ভগীরথ যদি বাড়ী না ফেরে? আত্মহত্যা করে বসতেও তো পারে!

সুধীন বললে, হুঁ।

তারপর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

রাণু হঠাৎ বললে, ভগীরথ ছাড়া পেয়েছে শুনে বৌটা যে কি খুশি। ঐ জর গায়েই উঠে বসে সে যে কত কথা। ওকে আগে থেকে জানাই নি বলে দুঃখ করছিলো।

সুধীন শুধু বললে, এখনো বসে আছে নাকি?

—তা তো থাকবেই। আহা, বেচারী। এখন মনে হচ্ছে ছাড়া পেয়েছে না জানালেই ভাল হ'ত।

—হুঁ। সুধীন হাসলো। বললে, ছাড়া পেয়েছে, মনের আনন্দে দেখবে যাও হয়তো কোন শুঁড়িখানায় গিয়ে ঢুকেছে।

বিচিত্র নয়, ভাবলো রাণু। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো ও। মিনিট কয়েক চুপ করে বসে থেকে নেমে পড়লো খাট থেকে।

বললে, যাই একবার দেখে আসি।

চারপাশে অন্ধকার, বারান্দার আলোটাও নিভে গেছে। আলো না জ্বেলেই পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো রাণু দোতলার বারান্দায়, সি ড়ির মুখে।

রাস্তার গ্যাসপোষ্ট থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে নীচের উঠোনটায়। আর সেই আলোয় রাণু দেখতে পেলো, ঠিক সিঁড়ির নীচের ধাপটায় বসে আছে ভগীরথের বৌ। মুখ দেখা গেল না, শুধু সাদা কাপড়টা ফুটফুট করছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রাণু। তার আগেই উঠে পড়লো ভগীরথের বৌ। উঠোনে অধৈর্য্য হয়ে পায়চারী করলো বারকয়েক, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার খিলটায় হাত রেখে মুহূর্ত্তকয়েক দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ কপাটটা খুললো, বাইরে গলা বাড়িয়ে হয়তো উঁকি মেরে দেখলো ভগীরথের বৌ। তারপর আবার কপাট বন্ধ করলো।

সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে নেমে এলো রাণু।

প্রথমটা চমকে উঠেছিল ভগীরথের বৌ। রাণু পিঠে হাত রেখে বললে, ঘুমোবে যাও ভাই, অত ভাবনার কি আছে। ছাড়া যখন পেয়েছেন, আসবেন ঠিকই।

—না, না, ও হয়তো আর আসবে না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো ভগীরথের বৌ।—ও হয়তো আর আসবে না দিদি।

—কেন আসবে না ? ও-কথা বলো না, যাও শোবে যাও। যেন উপদেশের স্বরেই বললে রাণু।

ভগীরথের বৌ চোখ মুছে তাকালো রাণুর মুখের দিকে। বললে, কি জানি দিদি, বড়ো ভয় হচ্ছে। ওর মত মানুষ, এতো ভালো, ...ও হয়তো লজ্জায় মুখ দেখাতে চাইবে না। হয়তো ভাববে, আমিও বিশ্বাস করেছি ও এমন কাজ করতে পারে।

রাণু বললে, চলো তো, যতসব বাজে কথা, ঘরে চলো। এই জ্বর নিয়ে সারারাত এখানে বসে থাকলে মারা পড়বে যে। এত কষ্ট করে যে ওঁকে বাঁচালে, ঘরসংসার করবে কাকে নিয়ে, তুমি যদি না বাঁচো !

বলে ঘরের ভেতর টেনে এনে শুয়েপড়তে বললো রাণু। কপালে হাত দিয়ে বললে, উ ! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।

লেপটা টেনে ঢাকা দিয়ে দিলো রাণু। বললে, কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে, উনি ফিরে এলে আমি দরজা খুলে দোব।

রাণু সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসছিল।

হঠাৎ ভগীরথের বৌ ডাক দিলো।—দিদি !

—কিছু বলছো ! ফিরে এলো রাণু।

রাণু কাছে এসে দাঁড়াতেই তার হাত ধরে পাশে বসতে বললো ভগীরথের বৌ। বললে, পুলিশ যা যা বলেছে আপনি বিশ্বাস করেন দিদি ?

—না।

আনন্দে হয়তো চকচক করে উঠলো ওর চোখ দুটো। অন্ধকারে বুঝতে পারলো না রাণু। ধীরে ধীরে চলে এলো ও।

সুধীনকে বললে, কি আশ্চর্য্য মন। এখনো বিশ্বাস করছে ভগীরথ নাকি এ কাজ করতে পারে না। চোখের সামনে চরিত্রটা তো

দেখতেই পেতো, তবু···

সুধীন উত্তর দিলো, অত সহজে চরিত্র বিচার করো না। ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে মানুষ এ-কথাটা মুখেই বলি আমরা, কিন্তু আসলে মানুষের যে দিকটা বেশি স্পষ্ট সেইটেই তার চরিত্র। এমন অনেক লম্পট আছে যারা হয়তো জীবনে হঠাৎ একদিন প্রাণ দিয়ে কোন মেয়ের সম্মান বাঁচিয়েছে—তাসত্ত্বেও তাকে লম্পটই বলবো। 'আবার এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি জীবনে লম্পটের মতই হয়তো কিছু করে ফেলেছিলেন—তবু তাকে মহাপুরুষই বলবো অনেক ভালো কাজ করার জন্যে। তাই তোমাদের সিদ্ধিমাতা আজ সিদ্ধিমাতা, অনুপমা নয়।

—বেশ কথা, তা বলে ভগীরথ মহাপুরুষ নাকি!

—তুমি তার কতটুকু জানো। তুমি জানো সে মদ খায় আর বৌয়ের ওপর অত্যাচার করে। কিন্তু মদ না খেয়ে মানুষটা কেমন থাকে তা শুধু ওর বৌই বলতে পারে। সব মানুষই তো এক, সবাই সাধারণ। অনেকগুলো ব্যাপারেই একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল। কিন্তু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মানেই অসাধারণ, অস্বাভাবিক। আর পাঁচজনের সঙ্গে যেখানে তার মিল নেই সেখানেই তার চরিত্র।

—বেশ বাপু বেশ, রাতদুপুরে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। বলে রাণু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো।

সুধীন হেসে বললে, আর তার জন্যে লোকটাকেও দোষ দেয়া যায় না। কেউ চরিত্র হাতে নিয়ে জন্মায় না। পরিবেশ তার চরিত্র তৈরী করে। চোর জোচ্চোরের সঙ্গে মিশে ভাল মানুষও চোর জোচ্চোর হয়ে যায়, ডাকাতের ছেলেও সৎসংসর্গে পড়লে সাধু হয়ে যেতে পারে। জীবনের সামান্য একটা ঘটনার জন্যে মানুষের চরিত্র

স্বভাব সবকিছু বদলে যায়। এই যে ব্যাপারটা ঘটলো, দেখো হয় তো ভালো হয়ে যাবে ভগীরথ।

রাণু বললে, হলেই বাঁচি।

সুধীন আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল। কে যেন খুব আস্তে আস্তে ঠুক ঠুক করে কড়া নাড়ছে নীচের দরজায়।

রাণু উঠে এলো আবার।

দেখলো, ও আসার আগেই ভগীরথের বৌ কপাট খুলে দিয়েছে।

চৌকাঠ পার হয়ে বাড়ীর ভেতর একটা পা ফেলতে না ফেলতেই লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারাটার ওপর যেন আছাড় খেয়ে পড়লো বৌটা। কান্নার রেশও যেন ভেসে এলো। আর রাণুর স্পষ্ট মনে হ'ল, এই আবছা অন্ধকারেও, যে ভগীরথ লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না।

আনন্দে খুশিতে রাণুর চোখেও জল এলো। তাড়াতাড়ি সরে এলো ও সেখান থেকে।

সুধীনকে ফিসফিস করে বললে, ফিরেছে।

—ফিরেছে? স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সুধীনও।

কোন কথা হ'ল না। ভগীরথের বৌয়ের চোখে শুধু খুশির অশ্রু, আর ভগীরথ নিশ্চুপ।

রাত কেটে গেল, দিনও। দিনির পর দিন।

তারপর একসময় অনুশোচনায় ভেঙে পড়লো ভগীরথ।

বললে, শোনো, একটা কথা বলবো। ক্ষমা করবে?

কৌতুকে মাথা নাড়লো ও।...উঁহুঁ।

—না, না। সব কথা তোমাকে বলবো আমি, তোমার কাছে অন্ততঃ লুকিয়ে রাখবো না। সত্যি দোষ করেছিলাম আমি, ক্ষমা করো তুমি, ক্ষমা করো আমাকে।

বিস্মিত ছু'চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো ভগীরথের বৌ। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।

বললে, হয়েছে, আর থিয়েটার করতে হবে না।

—বিশ্বাস করো তুমি, তোমাকে চিনতে পারি নি এতদিন, ভুল করেছিলাম। ভগীরথের গলার স্বরে ব্যগ্রতা ফুটে উঠলো।

তবু অবিশ্বাসে হাসলো ভগীরথের বৌ।—তুমি না চিনলেও, আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি। আমি জানতাম, তুমি এ-কাজ করতে পারো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভগীরথ। বললে, শোনো, মিছে দোষ ঢেকে রাখবো না। অন্যায় করেছিলাম আর সিন্‌হা সাহেবের কাছে শুনেছি সে-অন্যায়ের শাস্তি থেকে তুমিই বাঁচিয়েছো আমাকে। তাই ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে।

স্ত্রীর হাত ছুটো জড়িয়ে ধরলো ভগীরথ।

আর অবাক বিস্ময়ে তাকালো ভগীরথের বৌ।—সত্যি ? সত্যি দোষ করেছিলে তুমি ?

—হ্যাঁ। মাথা নীচু করে রইলো ভগীরথ।

আর ভগীরথের বৌ যেন ক্রমশঃ পাথরের চোখ মেলে তাকালো স্বামীর মুখের দিকে। সমস্ত জীবন, সমস্ত আনন্দ যেন এক মুহূর্তে উবে গেল। সব বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গেল তার।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সমস্ত শরীর কেমন যেন হাল্কা হয়ে গেছে,

যেন মাটির ওপর তুলছে সারা দেহ।

একেবারে দোতলায় রাণুর কাছে উঠে এলো সে। তখনই, সেই দুপুরেই।

শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলো রাণু। টের পায় নি কেউ ওর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। টের পেল না ভগীরথের বৌয়ের দুর্ব্বল ভীরু চোখে প্রতিহিংসার আগুণ জলছে।

হঠাৎ মুখ ফেরাতেই চোখোচোখি হ'ল। সহাস্যে রাণু প্রশ্ন করলো, কি খবর ভাই? এ ক'দিন যে দেখাই পাই নি?

ভগীরথের বৌও হাসলো। লজ্জার হাসি। কোন কথা বললো না।

রাণু অনুযোগ করলো আবার।—এখন আর আসবে কেন? দিন রাত কাছে বসে বরের সঙ্গে গল্প করেই তো কেটে যায়, কি বলো?

টেবিলের ওপর ছড়ানো বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনের বিষন্নতা দূর করে হেসে বললে, কখন আসবো বলুন, আপনারও তো সেই অবস্থা দিদি!

রাণু বললে, এই যে খুব কথা ফুটেছে এখন।

—আপনারাই তো কথা ফুটিয়েছেন। সত্যি দিদি, আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন, আত্মীয় স্বজনেও তা করে না।

বললে ভগীরথের বৌ, আর অন্যমনস্ক ভাবেই এটা ওটা নাড়তে নাড়তে দেয়ালের তাকে রাখা ওষুধের শিশিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

হঠাৎ একটা শিশি তুলে বললে, এটা কি ওষুধ? এত ওষুধপত্তের কেন দিদি আপনার ঘরে?

—বাঃ রে ডাক্তারের বাড়ীতে ওষুধ থাকবে না? বলে হাসলো রাণু।

ভগীরথের বৌ আরেকটা শিশি তুলে ধরলো।—এটা কি?

—ও আমার বাতের মালিশ। অমাবস্যা পূর্ণিমায় কি কষ্ট পাই

দেখো নি তো।

—ওমা, এই বয়সে বাত? বলেই আরেকটা শিশি তুলে ধরলো ভগীরথের বৌ। বললে, এটায় 'বিষ' লেখা রয়েছে কেন?

—বিষ বলেই বিষ লেখা রয়েছে। রাণু হেসে ফেলে বললে।

—সে কি? বাড়ীতে বিষ রেখেছেন এমনি ভাবে?

রাণু হেসে বললে, ওটা আসলে ওষুধ, সামান্য দু'এক ফোঁটা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু মাত্রার বেশি খেলেই মারা যেতে পারে, তাই 'বিষ' লেখা আছে।

—ওষুধ বেশি খেলে আবার মানুষ মরে নাকি! সরল ইস্কুলের মেয়ের মত মুখ করে প্রশ্ন করলো ভগীরথের বৌ।

রাণু উত্তর দিলো, খেয়ে দেখো না দু'তিন চামচ।

—কি হবে তা হ'লে?

—কি আর হবে, একেবারে স্বর্গলাভ।

খিলখিল করে হেসে উঠলো ভগীরথের বৌ। বললে, দরকার নেই বাবা, আমার মর্ত্তই ভালো।

বলে রাণুর কাছে এসে বসলো। গল্প সুরু করলো আজেবাজে। বললে, আপনারা আর এক সপ্তাহ পরেই নাকি দেশে ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ। কতদিন আর এখানে থাকা চলে। ফিরতে হবে না?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভগীরথের বৌ হঠাৎ জল খেতে চাইলো। রাণু বেরিয়ে গেল জল আনতে।

আর সেই মুহূর্ত্তেই দেয়ালের তাকে রাখা শিশিগুলোর দিকে ছুটে গেল ভগীরথের বৌ। বিষ লেখা শিশিটা বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসে বসলো আগের মতই।

বিষের মত তার নীল দুটি চোখ চকচক করে উঠলো।

কোলকাতা থেকে বিদায় নেয়া যখন একরকম ঠিকঠাক, তখন শেষবারের মত সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে যাওয়াই ভালো, এই ভেবে সুধীন এসেছিল ডাক্তার সেনের বাড়ীতে।

দেখা হতেই ডাক্তার সেন বললেন, আমিই যাচ্ছিলাম, সুরজিৎও হয়তো পৌঁছে গেছে এতক্ষণ।

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার গুরুতর। সুরজিতের বিয়ে।

—ও।

ডাক্তার সেন হাসলেন।—ও নয়। উঃ।

—মানে ?

—মানে ভ্রাতা আমার রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছেন, বাবা মা'র মন রাখবার জন্যে এখন মন্ত্রপড়া বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সুধীন সবিস্ময়ে তাকালো ডাক্তার সেনের মুখের দিকে। যেন কথাটা ঠিক্ বুঝতে পারে নি।

ডাক্তার সেন হেসে ফেললেন।—দায়ী তোমার স্ত্রী, তিনিই ঘটকালী করেছেন।

—সে কি ?

উত্তর এলো, ইন্দিরার সঙ্গে তিনিই তো শুনেছি—

ইন্দিরা ! কৌতুকে হাসলো সুধীন। বললে, যতকিছু অসম্ভব ব্যাপার দেখছি আমার চারপাশেই ঘটছে।

—অসম্ভব ? এর মধ্যে অসম্ভব কোনটা ? একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের আলাপ হবে, ঘনিষ্ঠতা হবে, পরস্পরের পরস্পরকে ভাল লাগবে অথচ বিয়ে হওয়াটাই অস্বাভাবিক ?

সুধীন বললে, অসম্ভব নয়, তবু কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। যেমন লিলিকে ভালবাসতে গিয়ে অনুপমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়া, কিংবা অনুপমার ট্রেণ থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে একেবারে সিদ্ধিমাতা হয়ে ফিরে আসা।

ডাক্তার সেন হাসলেন। বললেন, ভুল। কোনটাই অসম্ভব নয়। আমাদের সকলের জীবনেই এমন অনেক অস্বভাবিক ঘটনা ঘটে। আর এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার, স্মরণশক্তি আমাদের শুধু সেগুলোকেই মনে করে রাখে, সেগুলোই আমাদের জীবনের মোড় ফেরায়—কখনো ভালর দিকে, কখনো মন্দর দিকে।

সুধীনের গলার স্বরে কেমন যেন সন্দেহ প্রকাশ পেলো।—তাই কি ?

—হ্যাঁ তাই। জীবনে কত সাধারণ লোক তো দেখি আমরা, কত স্বাভাবিক ঘটনা। সেগুলো কি মনে থাকে! দিব্যি পড়াশুনো করে চাকরী করেছে, বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে, সুখে সংসার করেছে এমন বন্ধুই তো বেশি ছিল আমাদের হোস্টেলে। ধনঞ্জয়ই একমাত্র ব্যতিক্রম, আর তার কথাই মনে আছে।

সুধীন বললে সত্যিই তাই। সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করে এমন মেয়ে তো কতই দেখেছি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পায় নি বলেই অনুপমার ফুলমাসীমাকে মনে পড়ে, ভগীরথের বৌয়ের জন্যে কোর্টে ছোটাছুটি করি। অথচ পাশের অন্য অন্য বাড়ীতে যারা রয়েছে, ভাল ভাবে রয়েছে বলেই তাদের খোঁজ খবরও নিই নি কোনদিন।

ডাক্তার সেন যেন একটু বিষন্ন বোধ করলেন। বললেন, আমার

জীবনেও এমন অনেক কিছু ঘটেছে, থাক সে-কথা বলে আর কি হবে।

সুধীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সাহিত্যিকরা তাই বোধহয় অস্বাভাবিক দিক নিয়ে গল্প লেখে। সত্যি তো, যারা আর পাঁচজনের মত বড়ো হয়, বিয়ে করে, সংসার করতে করতে বুড়ো হয়ে মারা যায় তাদের কথা কে শুনতে চায়? যে ঘটনা হাজারে একটা ঘটে, যে চরিত্র লক্ষে একটা মেলে তাদের কথাই তো লেখে সাহিত্যিকরা। তার কারণ তাদের কথাই মনে থাকে, তাদের কথাই মানুষ শুনতে চায়। আমার জীবনে বেশির ভাগই তো স্বাভাবিক আর সাধারণ, কিন্তু সে-কথা আমার মনেই থাকে না। মনে পড়ে শুধু অসম্ভব ঘটনাগুলোই।

ডাক্তার সেন হেসে বললেন, এমনি এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়েছে সুরজিৎ। অতএব আরো দিনকয়েক থেকে যেতে হবে।

সুধীনও হাসলো। বললে, থাকতেই হবে।

সুরজিৎ আর ইন্দিরা দু'জনে একই সঙ্গে গিয়েছিল রাণুকে নিমন্ত্রণ জানাতে।

শুনে রাণুও হেসে উঠলো। গালে হাত দিয়ে বললে, ওমা, এর মধ্যে এত কাণ্ড। ডুব সাঁতার অনেকেই জানে। কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখে তারা। তোমরা যে দেখছি এপারে ডুব দিয়ে একেবারে ওপারে গিয়ে ওঠো!

রাণুর ভাবভঙ্গী দেখে ইন্দিরাও খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর নিজেই নিজের সপ্রতিভতায় লজ্জা পেল যেন।

সুরজিৎ বললে, আমি কিন্তু সুধীনদার সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি রাণুবৌদি। জমিজমা সব আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে,

ট্রাকটর নিয়ে চাষ করবো আমি।

রাণু হেসে বললে, বাঁশী যখন বাজাতে পেরেছো, গরু না চরালে চলবে কেন? রাধা যে কষ্ট পাবে। কিন্তু ইন্দিরা কি পাড়াগাঁয়ে থাকতে চাইবে?

ইন্দিরা বললে, শহরে অরুচি ধরে গেছে আমার। এর চেয়ে পাড়াগাঁ ঢের ভালো।

রাণু আবার হেসে উঠলো খিলখিল করে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, এত দূর?

ইন্দিরাও হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করলো।

শুধু যাবার সময় সুরজিৎ বললে, বিয়ের দিন যাবেন কিন্তু। নীলাকেও নিয়ে যাবেন।

বাধ্য হয়েই মাচন্দায় ফিরে যাওয়ার দিনটা পিছিয়ে দিতে হ'ল।

তেরপল টাঙানো হ'ল ইন্দিরাদের বাড়ীর ছাদে। রঙবেরঙের সামিয়ানার নীচে জললো উজ্জল আলোর মালা। আর বাড়ীর দরজায় মঙ্গল চিহ্ন আঁকা হ'ল, বসলো রোশনচৌকি। মন ভোলানো সুরে বাজতে সুরু করলো সানাই। সমস্ত পাড়াটা জমজমাট, আর তারই ফাঁকে একটি করুণ সানাইয়ের সুর।

দূর থেকেই কেমন যেন উদাস হাওয়া বইলো রাণুর চারপাশে। বিস্মৃত অতীতের একটি সুমধুর দিন মনে পড়ে গেল। প্রথম যৌবনের স্বপ্নে গড়া একটি দিন।

জীবনের একটি ব্যর্থতা ছিল রাণুর। তাও মুছে গেছে। স্বামীর দুর্বোধ্য রোগটাকে বড়ো ভয় ছিল রাণুর, সে রোগের অভিশাপ থেকে রেহাই পেয়েছে সুধীন। কিন্তু তবু যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারছে না। অথচ একদিন তো মনে হয়েছিল ঐ ব্যর্থতাটুকু মুছে গেলেই শান্তি পাবে রাণু, স্বস্তি আর সুখ পাবে।

মা, বাবা, ভাই, বোন। সেই ছোট্ট রেল-কলোনীটার কথা মনে পড়লো রাণুর। বাবার কলিকের ব্যথাটা কি সেরেছে? কে জানে। শম্ভু আর ভোলা—কতদিন দেখে নি তাদের। আর মুন্না? সেও হয়তো অনেক বড়ো হয়ে গেছে। হয়তো চিনতেই পারবে না রাণুকে। আচ্ছা, পোর্টার খুলির পাশ দিয়ে কি এখনো ট্রেণ যাবার সময় হুইস্‌ল্ বাজায়? দুর্গামন্দিরের চত্বরে থিয়েটর হয়? রাত জেগে কি দেখে

আজকালকার মেয়েরা ?

কত কথা মনে পড়ে, কত ভুলে যাওয়া দৃশ্য নতুন করে চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেছে সারি সারি রেলের লাইন। জংসন স্টেশনের কর্ম্মব্যস্ত ট্রেণ আর ইঞ্জিনের অবিরাম যাতায়াত সেই লাইনের ওপর দিয়ে। ইঞ্জিন শেডের আকাশে এক-চিমনি কালো ধোঁয়া আর শহরের পশ্চিম প্রান্তে রেলের কারখানা। ভোর হলেই পাঁচটা বাজার ভোঁ বাজতো। রাশি রাশি লোক, শুধু কি বাঙালী! পৃথিবীর সব জায়গার কুলি মিস্ত্রী ফিটারের দল সার বেঁধে হাঁটতো কারখানার দিকে। ছত্তিশগড়িয়া কামিনের দল পায়ের মল বাজিয়ে হাততালি দিতে দিতে এগিয়ে যেতো কারখানার ফটকের দিকে। আর বাড়ীর খিড়কি দরজায় এসে দাঁড়াতো রাণু, দেখতো তাদের হাসি আর আনন্দের পথচলা। তারপর ছ'টার সময় আরেকবার ভোঁ বাজতো। হাজার হাজার লোক, লোক নয়, ঝাঁক ঝাঁক সাইকেল যেন বিদ্যুতের মত পার হয়ে যেতো রাণুর চোখের সামনে দিয়ে। হাজার হাজার সাইকেলের চাকা থেকে ঝর্ণার মত একটা ঝিরঝির শব্দ আসতো মিনিট কয়েকের জন্যে। শব্দটা আজো যেন কানে বাজে রাণুর।

আজকাল আর ভোঁ বাজে না। কে যেন বলছিল, শহরটা বদলে গেছে আজকাল। ভোঁ উঠে গিয়ে সাইরেন এসেছে।

পাখীর মত উড়ে উড়ে যেন রাণুর মনের চোখদুটো ফেলে আসা দিনের সেই শহরটা প্রদক্ষিণ করে বেড়ালো। আর সানাইয়ের সুরে উদাস মনে দীর্ঘশ্বাস পড়লো মাঝে মাঝে।

উপনগরের দক্ষিণে কতবার বাবার হাত ধরে শীতকালের ভোরে বেড়াতে গিয়েছে রাণু। সে পৃথিবী তখন দূর থেকে দেখার জগৎ

ছিল শুধু। সুন্দর সুন্দর বাংলোর সারি। আর বাংলো ঘিরে বিরাট এক একটা বাগান। কত রঙবেরঙের ফুল ফুটে থাকতো সে বাগানে। রাণুর ইচ্ছে হ'ত ছুটে গিয়ে দুটো ফুল তুলে আনে। কিন্তু পারতো না। বাবা বলতেন, ও হ'ল সাহেবদের বাংলো। ফুল তুললে পুলিশে দেবে। আর নয় তো চাকরী যাবে তাঁর। প্রত্যেকটা বাংলোতেই যেন এক ধাঁচের কাঠের জাফরি, টালীর ছাদ। আর প্রতিটি বাংলোর চারপাশ ঘিরে ফুলের বাগান। রাস্তাগুলোও পরিচ্ছন্ন নির্জ্জন। দু'পাশে কত নাম-না-জানা বিরাট বিরাট গাছ, শীতের সকালে মুচকুন্দ ফুলের রাশি পড়ে থাকতো পথের ওপর। সাহেবপাড়া পার হয়ে আরো দক্ষিণে চাঁদমারির ময়দান, সাহেবদের বাচ্চা বুড়ো সবাই বন্দুকের নিশানা শিখতো সে মাঠে। উঁচু একটা ঢিবির ওপর গোল গোল নম্বর মারা চাকতি। আর তারও দক্ষিণে, অনেক দূরে দেখা যেত হিজলীর জেলের চূড়া। এক সময় ওটা নাকি এ উপনগরের আদালত ছিল। আদালত থেকে জেল—হাসতো সবাই। ভোলার সঙ্গে একবার এই মাঠে এসেছিল রাণু, কাউকে না জানিয়ে। ঘাসের ভেতর লাল ভেলভেটের টুকরোর মত পোকা—বীরবাবটি, সেই বীরবাবটির খোঁজে। সিঁদূরের কৌটোয় ঘাস বিছিয়ে তার ওপর রাখতো বীরবাবটিগুলো। আর কি একটা মন্ত্র আওড়ালেই চলতে সুরু করতো সেগুলো।

আচ্ছা, গোল বাজারের সেই তেলে ভাজার দোকানটা কি এখনো আছে? মেয়েদের ইস্কুলটা নাকি দোতলা হয়েছে, কে যেন বলেছিল। রাণুর বেশ মনে আছে, ওদের চার নম্বর কোয়ার্টারের পাশেই ছিল মেয়েদের ইস্কুলটা। এখন হয়তো হাইস্কুল হয়ে গেছে। দেশী ক্রিশ্চানরা নতুন পোষাক পরে প্রতি রবিবারে যেত দেশী গির্জ্জাটায়—ওদের

বাড়ীর সামনে দিয়ে, আর ওদের বাড়ীর আড়াল থেকে মেয়েগুলো 'তিনপটিয়া তিনপটিয়া' বলে রাগাতো তাদের। কথাটার মানেও জানতো না কেউ, মানে কিছু আছে কিনা তাও জানতো না, তবু ক্রিশ্চানদের ছেলেগুলো চটে যেত। ঢিল ছুঁড়তো কখনো সখনো।

সবচেয়ে বেশি জোরে চেঁচাতো পাশের বাড়ীর ভক্তি আর মায়া। রোজ আসতো ওরা ফুল কুড়োতে। কোনের শিউলি গাছটায় কি ফুল যে হ'ত, সারা বাগান ভরে যেত। ইস্কুলের সবারই কাপড় ছোপানো হয়ে যেত বাসন্তী রঙে, ঐ একটা গাছের শিউলির বোঁটায়।

তারপর একদিন হঠাৎ শুনলো রাণু, ওর নাকি বিয়ে। দেখতে আসবে কারা। ঐ একবারই। বিয়ে হয়ে গেল রাণুর। সবাই খুশিতে উপছে ওঠলো। বললে, এমন ভাগ্যবতী মেয়ে বাঙালীর ঘরে হয় না। একবার মেয়ে দেখিয়েই বিয়ে! মেয়েদের মহলে রাণুর সম্মান বেড়ে গেল যেন রাতারাতি। কতই বা বয়স তখন। যে মা খুন্তী নিয়ে তাড়া করতো এতটুকু দোষ ঘটলে সেই মা একটা দিনেই যেন কত বড়ো বন্ধু হয়ে উঠলো।

বিয়ের দিনটা বিশেষ করে মনে পড়লো রাণুর। সুধীন ইচ্ছে করেই কি সম্প্রদানের সময় ওর হাতটা চেপে ধরেছিল? ফুলশয্যার দিন কি লজ্জা! কিছুতেই যেন মুখ তুলতে পারছিল না। অথচ সুধীন কত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছিল। সে-সব দিনের কথা স্মরণ করে মুগ্ধ আবেশের হাসি ফুটে উঠছিলো রাণুর মুখে। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙতেই দীর্ঘশ্বাস লুকোলো রাণু।

কিন্তু সুধীনের চোখে পড়লো না সানাইয়ের করুণ কান্না ভেসে আসছে যেন, বাতাসে শরৎসন্ধ্যার স্নিগ্ধতা। অদূরের আলো-ঝলমল

রোশনচৌকি আর ছাদের রঙ বেরঙের সামিয়ানা সুধীনের চোখ থেকে মুছে গেল, মন ছুটে গেল দূর অতীতে।

সত্যি, এই ক'টা বছরে কোলকাতা শহরটা যত না বদলেছে তার চেয়ে অনেক বেশি বদলে গেছে শহরের মানুষ। সুধীনের বেশ মনে আছে, কলেজে পড়বার সময় মাঝে মাঝে শহরের এই দক্ষিণ উপকণ্ঠে বেড়াতে আসতো ওরা কয়েক বন্ধু। তখন তো ট্রাম লাইনের দু'পাশে শুধু এক সারি বাড়ী ছিল, আর ভেতরের দু'একটা গলির পাশে দু'চারটে ইঁটের পাঁজা। পার্কটা পার হয়েই ডিপোয় ঢুকতো ট্রামগুলো। আর কি বিশ্রী ধরনের ট্রামই না চলতো তখন। পা দানিতে উঠতে হ'লে রীতিমত কসরৎ করতে হ'ত, আর বেঞ্চিগুলোও ছিল কাঠের। চলতো মৃদু মন্থর গতিতে, টাল খেতে খেতে। আর ট্রামের ড্রাইভার কণ্ডাকটার ছিল সব হিন্দুস্থানীরা। অথচ এই কয়েকটা বছরে সব কিছু বদলে গেছে, ঝকঝকে নতুন ধরনের ট্রাম চলেছে সারি বেঁধে, বসবার আসনগুলো গদি আঁটা। কিন্তু আগেকার দিনের সেই দোতলা বাসগুলো আজ আর নেই। কোন কাজ না থাকলে প্রায়ই তো সেই দোতলা বাসের সামনের সীটে বসে হাওয়া খেতে খেতে আসতো ওরা এপাড়ায়। বাস তো নয়, যেন হাওয়া-ঘর। চারপাশ খোলা। প্রথম প্রথম তো বাসের মাথাটাও ঢাকা থাকতো না। বৃষ্টির জন্যে শেষে ছাদ দেয়া হ'ল দোতলা বাসের। সে জায়গায় আজকের এগুলো শুধু দেখনসই, গরমে হাঁফিয়ে উঠতে হয়।

সুধীনের মনে পড়লো, ট্রাম ডিপোতে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এদিকটায় আসতে হ'ত। মধ্যে মাঝে দু'চারখানা বাড়ী দেখা যেত। আর সন্ধ্যে হলেই শেয়াল ডাকতো এ পল্লীতে। বড়ো রাস্তাটার দু'ধারে শুধু হাল ফ্যাশনের কয়েকখানা বাড়ী উঠেছে তখন, কিন্তু সকলে

বলতো, বাড়ীগুলো নাকি সবই বন্ধক দেয়া। তাই রাস্তাটাকে বিদ্রূপ করে নাম দেয়া হয়েছিল মর্গেজ এভেনিউ। আর বাসিন্দেদের সম্বন্ধে কত কি রটনা শোনা যেত। বিশেষ করে এ পাড়ার মেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি ঠাট্টা বিদ্রূপের অন্ত ছিল না। জলার ধারে ঝোপঝাড়-গুলোর নাম ছিল বৃন্দাবন। সন্ধ্যে হতে না হ'তে জোড়া জোড়া নারীপুরুষের প্রেমালাপ শোনা যেত ওদিকটায়। কিন্তু তারা সকলেই ছিল অন্য সমাজের, অন্য জগতেরও যেন। তাদের সম্বন্ধে গল্পই শোনা যেত, কাছে আসতে পারতো না সুধীনরা।

অথচ এই ক'টা বছরে কতই না বদলে গেছে সব। চারিদিকে নতুন নতুন বাড়ী, এতটুকু সবুজ ঘাস দেখা যায় না আর। রেল লাইন পার হয়েও বসতি এগিয়ে গেছে।

শুধু কি এদিকটায়? সহরের উত্তরেও পুরোনো রোগা নোংরা গলিগুলোর আশে পাশে মান্ধাতা আমলের যে পচা ধ্বসা বাড়ীর সারি দেখে এসেছে ওরা সেগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। চওড়া রাস্তা তৈরী হয়েছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের।

এমনি এক পুরোনো গলির ধারেই থাকতেন অনুপমার ফুলমাসীমা। স্বামীপরিত্যক্তা ফুলমাসীমার চেহারাটা হঠাৎ যেন চোখের সামনে ঝলকে উঠলো। প্রথম যেদিন দেখেছিলো সেদিন ফুলমাসীমাকে চিনতো না সুধীন। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অনুপমাকে তুলে দিয়েছিলেন সুধীনের হাতে। ট্রেনে সামান্য একটু পরিচয় পেয়েছিল তাঁর, কিন্তু তারপর...

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুধীন। বুকের মধ্যে যেন গভীর একটা বেদনাবোধ।

অনুপমাকে হারানোর পর ব্যথা নিয়েই ফিরে এসেছিলো সুধীন।

তারপর সেই ধনঞ্জয়ের মুখোমুখি বসে থাকা, কথা-না-বলা। আর সেই সময়েই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ফুলমাসীমার বাড়ীতে যাতায়াত সুরু হয়েছিল সুধীনের। জেনেছিল তাঁর পিছনের কান্না-লুকোনো ইতিহাস। অথচ মুখেচোখে এতটুকু ক্লান্তি, এতটুকু হতাশা দেখতে পায়নি তাঁর। সব সময়েই হাসিখুশি মুখ, কৌতুক আর রসিকতা। সব সময়ে সাজগোজ করে থাকতেন ফুলমাসীমা, আর সদাই মুখে মাখতেন হাসি।

ফুলমাসীমাদের সেই বাড়ীটা মাটিতে মিশে গেছে, গলিটা ভেঙে চওড়া রাস্তা বেরিয়ে গেছে বহুদূর পর্য্যন্ত। শহরটা বদলে গেছে অনেক, তার চেয়েও বেশি বদলেছে মানুষগুলো—সুধীনের মনে হ'ল।

লিলি। নির্ব্বাক্ নিশ্চুপ লজ্জিত একটি প্রেম।

আর অনুপমা। কত ভয়, কত সীমার বন্ধন। লুকিয়ে দেখ করা, দেখা না হওয়া, বাধা পাওয়ার ভয়ে দূরের ঠিকানায় যাত্রা করা এমন ভীরু প্রেম সত্যিই হয়তো বাঁচে না, বাড়ে না। এ যেন সুগন্ধ ধূপের মত। যতক্ষণ পোড়ে ততক্ষণই সুরভি ছড়ায়। তারপর এক সময় শেষ হয়ে মিলিয়ে যায়, সুগন্ধ উড়ে যায় বাতাসে। ছাইয়ের মত পড়ে থাকে এক টুকরো স্মৃতি। অবসরে অবহেলায় নাড়াচাড়া করে সময় কাটে শুধু। অথচ কত বদলে গেছে এরা। সুরজিৎ আর ইন্দিরা। স্বতস্ফূর্ত্ত। এরা হাত বাড়িয়ে কামনাকে কুড়িয়ে নিতে জানে। অন্ধকার খোঁজে না নিজের মনকে লুকিয়ে রাখার জন্যে। গ্যাসপোষ্টের তলায় স্পষ্ট আলোয় এদের আনাগোনা। মধুমুহূর্ত্তের স্বপ্নবোনা নয়, মধুর জীবনের প্রহর কাটাতে জানে কথা আর হাসিতে। বুকে সৎসাহস নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে জানে। ভীরুতা আর লজ্জা নয়, বিশ্বাস আর আত্মপ্রকাশ। কত বদলে গেছে মানুষের মন, ভাবলো সুধীন।

তারপর কোন্ এক মুহূর্তে হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভেসে এলো সানাইয়ের মন ভোলানো সুর। মিঠে কান্নার সুরে সানাই বেজে চলেছে তখনো।

আর তখনও স্বপ্ন দেখছে নীলা। একটি শিশির ভেজা ভোরের কুঁড়ি যেন ধীরে ধীরে পাপড়ি খুলছে। কপাট খোলা কামনায় ঘরখানা যেন শূন্য পড়ে রয়েছে। অজানা অচেনা অতিথির জন্যে এক অভিসারিকা যেন প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। মনের কাছে সে অতিথির রূপ যেন চেনাজানা। ধীর পায়েই সে আসবে, হাতে হাত স্পর্শ করবে, ডাকবে তার পরিচিত নাম ধরে। চলবে দু'জনে একই সঙ্গে। কিন্তু, কেন এই সানাইয়ের মিথ্যা সুর, কেন এই আলোর উচ্চকিত ঘোষণা। এ সবই যেন বিরক্তিকর মনে হয় নীলার। মনে হয়, মানুষ যেন কত পিছিয়ে রয়েছে। সংস্কারের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষগুলো যেন হাসির খোরাক। দু'জন দুজনকে ভালবেসেছে। পরস্পর পরস্পরকে বেঁধেছে বিশ্বাসের বাঁধনে। স্বীকৃতির স্বাক্ষরে। তবে কেন এই চন্দনের চিত্রলেখা, রাঙা চেলীর উদ্দামতা, মন্ত্রপাঠের উন্মত্ততা! নীলার মনে হয় যেন মানুষ এতটুকু সামনে চলতে শেখেনি। পড়ে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের বন্ধজালে। কেন এই মিথ্যার অভিনয়, খুঁজে পায় না নীলা।

তারপর একসময় তন্ময়তা ভেঙে যায় তার। গান আর আলো, রঙ আর পোষাকপরিচ্ছদের চাকচিক্যের ভিড়ে হারিয়ে যায়।

রাণু আর সুধীন এসে দাঁড়ায় বিবাহ-মণ্ডপে। কথা, গল্প, হাসি। সময় কেটে যায় তন্দ্রার মত দ্রুত তালে।

বিদায় নিতে চায় সুধীন।

ইন্দিরা এসে দাঁড়ায় হাসিমুখে। প্রণাম করে সুধীনকে, রাণুকে। কৌতুকের হাসি আর লজ্জা উঁকি দেয় ওর চোখের কোণে।

তারপর রাণু বিদায় চায়। হেসে আশীর্ব্বাদ জানায়।

লজ্জিত মুখ তুলে ইন্দিরা তাকায় সুধীনের দিকে।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে ইন্দিরা। মুখে লাল বেনারসীর আঁচল চাপা দিয়ে।

—হাসছো যে। বিস্মিত কৌতুকে প্রশ্ন করে সুধীন।

ইন্দিরা হাসি চেপে বলে, ট্রিকটা শিখিয়ে দিলেন না তো? রাণুর দিকে ফিরে বলে ওঠে, ভারী কৃপণ উনি, না রাণুমামীমা?

রাণু হেসে বলে, কৃপণ তো সকলেই। তোমাদের মত বিলিয়ে দিতে আর ক'জন পারে বলো।

বিষ !

বিষজর্জ্জর দেহ নিয়ে নেমে এলো ভগীরথের বৌ। কোথায় লুকোবে শিশিটা যেন খুজে পাচ্ছে না। কখনো বিছানার তলায়, কখনো ট্রাঙ্কের কাপড়ে ঢেকে, আর তারপরই সেখান থেকে লক্ষ্মীর ঝাঁপির আড়ালে নিয়ে গিয়ে রাখলো।

প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যেন। সিঁড়িতে সামান্য একটু শব্দ হলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে, বাতাসের শব্দে চমকে উঠে উঁকি মেরে দেখে রাণু নেমে আসছে কিনা। পোষা বেড়ালটার ডাক শুনে ফিরে তাকায় ভয়ে ভয়ে।

কেবলই ভয়, এখনই বুঝি রাণু টের পাবে। বিষের শিশিটা খুজে না পেয়ে হয়তো সটান এসে দাঁড়াবে ওর সামনে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে হাত বড়াবে ; ফেরৎ চাইবে শিশিটা।

ছোট্ট একটা ওষুধের শিশি, কিন্তু ভগীরথের বৌ ভাবলো কি এক অমূল্য ধনই না খুজে পেয়েছে সে।

দেয়ালে টাঙানো বড়ো আয়নাটা, যে আয়নাটা সখ করে ভগীরথ একদিন নীলামে কিনে এনেছিল, তার সামনে কখন নিজেরই অজান্তে এসে দাঁড়ালো ও। নিজেরই চোখে চোখ রেখে দাঁড়ালো। বেড়ালটা পায়ে পায়ে ঘুরছে। বিরক্ত হয়ে উঠলো ও।

কোথায় গেল সেই সরল সুন্দর মুখখানা! কপালে কুঞ্চন রেখা, কানের পাশে দু'এক খি চুলে যেন পাক ধরেছে দীর্ঘ দীর্ঘ দুশ্চিন্তায়,

শরীরের যৌবন অবহেলায় ভেঙে গেছে। কি আশ্চর্য্য! এই ক'টা মাসেই এমন পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, টের পায় নি ও!

কিন্তু কেন? কেন এই দুশ্চিন্তা, এই নিঃশেষ নিঃস্বতা? কার জন্যে?

স্বামী। শব্দটা যেন উপহাসের মতই শোনালো তার নিজের কানে। জ্বালা করে উঠলো দুই চোখ। বেড়ালটা চুপ করে বসেছিল, একটা লাথি বসিয়ে দিতেই দূরে সরে গেল সেটা মিউ মিউ করে।

প্রেম, ভালবাসা। হ্যাঁ, প্রেমই অন্ধ করে রেখেছিল ওকে। তাই স্বামীর সব দোষ ক্ষমা করতে পেরেছিল ও, সব অত্যাচার সহ্য করতো হাসি মুখে। শুধু একটাই সান্ত্বনা, একটাই স্বস্তি ছিল জীবনে। স্বামীর ভালবাসা। ভাবতো, ওকে ঘিরেই স্বামীর মন বিশ্রাম খোঁজে। ভাবতো, পৃথিবীর সব মেয়ের লুব্ধ চাহনি থেকে দূরে থাকে ভগীরথ। আর তাই, দিনে দিনে দুশ্চিন্তায়, দারিদ্র্যে, আত্মবিক্রয়ের অমর্য্যাদায় জরাতুর মন নিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে ও। নির্লজ্জ শয্যার বিনিময়ে চেয়েছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা।

কিন্তু ওর সব বিশ্বাস যে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে তাকে ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করতে পারবে না ও।

অধৈর্য্য হয়ে উঠলো ও। অশান্ত মন নিয়ে এ ঘর থেকে ওঘর করে বেড়ালো। তারপর শিশিটা আঁচল ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসে বসলো উনুনের ধারে। বেড়ালটা লাথি খেয়েও ফিরে এসে বসলো ওর কাছে। রাগে ঠোঁট কামড়ালো ও।

ইচ্ছে হ'ল সবটুকু বিষ ভগীরথের খাবারে মিশিয়ে দিতে। প্রতিশোধ নেবে ও, প্রতিশোধ নিতেই হবে। এ বিশ্বাসভঙ্গের দাম দিতেই হবে ভগীরথকে।

হু'চামচ! রাণুর কথাটা মনে পড়লো। হু'চামচ মিশিয়ে দিলেই মৃত্যু।

সত্যি কি তাই! কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। মাত্র কয়েক ফোঁটা এই বিষ প্রতিশোধের ক্ষুরধার অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে? সত্যি?

হু'হাতা হুধ নিয়ে বাটিতে রাখলো ও। হু'চামচ আন্দাজ বিষ ঢেলে দিলো।

বেড়ালটা মিহিকণ্ঠে মিউ মিউ করে এগিয়ে এলো হুধের লোভে। সেদিকে তাকিয়ে নৃশংস হাসি হাসলো ভগীরথের বৌ। বাটিটা সরিয়ে দিলো বেড়ালটার মুখের সামনে।

চুক চুক করে হুধটা খেয়ে আবার একটু দূরে গিয়ে বসলো বেড়ালটা। আর ভগীরথের বৌ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কেটে গেল। চোখ বুজে বসে রইলো বেড়ালটা। এতটুকু নড়াচড়া করলো না।

তারপর একসময় হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলো ভগীরথের বৌ। সন্ত্রস্ত হয়ে শিশিটা লুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে উঠে এলো। কপাট খুললো। কপাট বন্ধ হ'ল।

ভগীরথ ঘরে ঢুকলো ক্লান্ত অবসন্ন পা টেনে টেনে।

বললে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে আমার।

—খাবে না?

—দাও। ব'লে ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো ভগীরথ।

ভগীরথের বৌ ফিরে এলো রান্নাঘরে। বেড়ালটার দিকে চোখ যেতেই পা থেমে গেল ওর।

বেড়ালটা একপাশে হেলে পড়ে আছে। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলো ও, নাড়া দিলো ঘনঘন।

না। রাণুর কথাই ঠিক্।

সেখানেই বসে পড়লো ও। ছি ছি, কি নৃশংস কাজই না করতে যাচ্ছিল ও। কল্পনা করাও পাপ।

স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিল ও? ছি ছি!

তার চেয়ে নিজেকে হত্যা করাই ভালো। তা হ'লে এ অবিশ্বাসের রাজত্ব থেকে, এ অসহন অবস্থা থেকে রেহাই পাবে ও।

ভগীরথের জন্যে ভাত বেড়ে দিয়ে শিশিটা হাতে নিয়ে বসে রইলো ও। কি করবে কিছুই যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

বেড়ালটাকে পাঁচিলের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাবতে বসলো। এ অমূল্য সম্প্রদের সদ্ব্যবহার করবে সে নিজেই। হ্যাঁ।

শিশিটা আবার লুকিয়ে রেখে ভগীরথের থালার সামনে এসে বসলো ও। ঘাড় গুঁজে এক মনে খেয়ে চলেছে ভগীরথ।

কি এক দুশ্চিন্তার ছাপ যেন ভগীরথের চোখে মুখে।

ভগীরথ হঠাৎ বললে, আর কেউ ক্ষমা না করুক, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তা না হ'লে, তা না হ'লে বাঁচবো না আমি।

ভগীরথের বৌ নিজের মনেই হাসলো। মনে হ'ল, স্বামী তার কত অসহায়।

না, অসহায় নয়। পরের দিনেই জানা গেল।

পাড়ার লোক ভিড় করে এলো।

সুধীন আর রাণু দু'জনে দু'জনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

এও কি হতে পারে? এমন কি করে হয়?

দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তা আর কারাবাসে কাটিয়ে অভাবনীয় ভাবে যে লোকটা মুক্তি পেলো, স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে সে? না, ভগীরথের বৌয়ের বিষের মত নীল দুটি চোখে যে জ্বালা দেখেছিল রাণু,—

না, না। তা হ'তে পারে না। নিজের চোখেই তো দেখেছে রাণু, কি ভাবে দিনের পর দিন স্বামীর মঙ্গল কামনায় শীর্ণ হয়ে গেছে তার শরীর। দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হতে দেখেছে তাকে।

তাও কি হয়?

রাণু শুধু দেখলো এক কোণে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ভগীরথের বৌ। চোখে জল নেই তার।

হঠাৎ ভগীরথের বুকের ওপর আছড়ে পড়লো বৌটির শীর্ণ রোগ-পাণ্ডুর দেহ। চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ও।

রাণু আর সুধীন সরে এলো সেখান থেকে।

ওপরে উঠে এসে রাণু বললে, আর নয়। চলো এখান থেকে।

নীলা ভয় ভয় চোখ মেলে বললে, আমাকেও নিয়ে চলো দাদা; এখানে থাকতেও ভয় করছে আমার।

মহাদেববাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আর বুড়ো হয়েছি এবার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বসবো।

ভগীরথ আর ভগীরথের বৌকে মন থেকে মুছে ফেলে স্টেশনে এসে পৌঁছলো সুধীন আর রাণু। সেদিন রাত্রেই নীলা আর মহাদেববাবু এলেন ওদের গাড়ীতে তুলে দিতে।

ইন্দিরা আর সুরজিৎ এসেছিলো অন্য কাজে। স্টেশনের ভিড়ের মাঝেও চিনতে পারলো রাণু।

চোখোচোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকলো রাণু।

এগিয়ে এলো ওরা।

একমুখ হাসি নিয়ে ইন্দিরা বললে, সে কি,না জানিয়েই চলে যাচ্ছেন ?

—হঠাৎ ঠিক্ হ'ল ভাই, জানিয়ে আসার সময় ছিল না।

সুরজিৎ অনুযোগ করলো।—আমি ভাবতেই পারিনি রাণুবৌদি। আমাকেও না জানিয়ে চলে যাচ্ছেন ?

শুধু একমুখ হাসির উত্তর দিলো রাণু। তারপর ঘোমটাটা একটু টেনে দিতেই মহাদেববাবু সুধীনকে নিয়ে সরে গেলেন।

আর ওরা সরে যেতেই ঘোমটা খুলে স্বস্তিতে বসলো রাণু।

বললে, কি ঠিক্ করলে ঠাকুরপো ? আসছোতো আমাদের গাঁয়ে ?

—নিশ্চয়ই। ট্রাকটার কেনার ব্যবস্থা হ'লেই।

ইন্দিরা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, ট্রাকটার কিনলেই যেন ওকে কেউ চাষা বলবে না।

রাণু হাসলো।—কথাটা সত্যি। গরুর গাড়ী চালালেই গাড়োয়ান। আর মোটর চালালে ড্রাইভার।

সুরজিৎ বললে, আর এরোপ্লেন চালালে পাইলট। জাত সব কটারই গাড়োয়ানের, অথচ সম্মানের কত পার্থক্য।

—তাই বুঝি লাঙলের চাষ করতে চাও না? তা হলে তো আমাদের সঙ্গে কথাই বলবে না মনে হচ্ছে।

সুরজিৎ উত্তর খুঁজে পেলো না, হাসলো শুধু।

মিনিট কয়েক পরেই হুইস্‌ল্ বাজলো। সুধীন ফিরে এলো। কামরায় উঠলো। আর নীলা, ইন্দিরা, সুরজিৎ সবাই নেমে পড়লো।

কামরার জানালায় দাঁড়িয়ে মহাদেববাবু সাবধানে থাকবার উপদেশ দিলেন।

সুধীন শুনলো ঘাড় কাৎ করে। তারপর নীলাকে বললে, বাবার অসুবিধে হবে তাই তোকে নিয়ে গেলাম না। আরেকদিন এসে নিয়ে যাবো।

নীলা ঠোঁট ওল্টালো রাগে, অবিশ্বাসে।—কত বারই তো নিয়ে গেলে!

সুরজিৎ বললে, আহা চটছো কেন। আমরাও তো যাবো, তখন নিয়ে যাবো তোমাকে।

সকলেই হেসে উঠলো ওর কথায়।

ট্রেণ ছেড়ে দিলো।

সুধীন বললে, ইন্দিরা, সুরজিৎ! আসছো তো ঠিক?

সুরজিৎ সায় দিলো।

আর ইন্দিরা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, ট্রিকটা শিখিয়ে না দিয়েই পালালেন তো! এবার কিন্তু গিয়ে ট্রিকটা শিখে আসবো?

রাণু ধমক দিলো সঙ্গে সঙ্গে।—আসবো কি? থাকবো বলো।

ইন্দিরা কোন জবাব দিলো কিনা শুনতে পেলো না রাণু। ক্রমশঃ প্লাটফর্মের আওতা ছাড়িয়ে আসছে তখন ট্রেনটা। রাণু আর সুধীন দু'জনেই জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখলো।

নীলা হাত নাড়ছে তখনো। আর, আর মহাদেব বাবুর চোখে কি কিছু পড়েছে? না এমনিই কোটের হাতায় চোখ ঘষলেন?

সুধীনের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

দুরন্ত গতিতে ছুটতে সুরু করেছে ট্রেণটা। এমনি দুরন্ত গতিতেই জীবনের ট্রেণ ছুটে চলেছিল একদিন। সেই নিঃশব্দ রাত্রির বুকে অনির্দ্দেশ যাত্রার রুমঝুম রুমঝুম সুর ভেসে এলো।

তারপর হঠাৎ কখন যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সুধীনের। সুর থেমে গিয়েছিল। সুরু হয়েছিল অবোধ্য এক অন্বেষণ। জীবনের, মনের।

ট্রেণের কামরার চৌকো জানালার সবুজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন উদাস তৃপ্তিতে ভেসে বেড়ালো।

জীবন চলেছে, ছুটে চলেছে এই ট্রেণের মতই। কিন্তু কিসের পিছনে? কিসের খোঁজে?

শান্তি?

না। শান্তি জীবনের পিঠে পূর্ণচ্ছেদ। জীবন নয়।

সান্ত্বনা?

না। সান্ত্বনা গোপন মনের দুর্ব্বলতা। জীবন নয়।

শক্তি?

না। পূর্ণকুম্ভ অহঙ্কারের ঘোলাজল হ'ল শক্তি। জীবন নয়।

উচ্চাশা ?

না। চরম ব্যর্থতার দূর-নিশানার অন্য নাম উচ্চাশা। জীবন নয়।

উন্মন চোখে কি যেন খুঁজে চলেছে সুধীন। বৃষ্টি ভেজা সবুজ প্রান্তরের সঙ্গে যেখানে আকাশ মিশেছে সেই দূর চক্রবালে নিরুদ্দেশ দৃষ্টি মেলে দিয়ে সুধীনের মন কি যেন খুঁজে ফিরলো।

একটা মেটেরঙ শঙ্খচিল অবিরত চক্র দিচ্ছে আকাশের গায়ে। আর দীর্ঘপুচ্ছ রঙিণ পাখি টেলিগ্রাফের তারে। জলার ধারের ফুটফুটে সারসগুলো উড়ে পালালো।

তৃপ্তির চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে একটি চাষী বৌ, মাঠের আঁকাবাঁকা আলের ওপর। অচেনা মুখের ভিড় দেখার দৈনন্দিন নেশা মেটাচ্ছে হয়তো।

কিন্তু এ সবের দিকে চোখ নেই সুধীনের।

ওর বুকে শুধু অনেক ইতিহাস মুছে ফেলার দীর্ঘশ্বাস। জীবন অন্বেষণের দৃষ্টি।

জীবনকে অন্বেষণ করার জন্যেই জীবন।

জীবনের নাম বিশ্বাস।

বাঘছালের খোলস থেকে মুখ বাড়িয়ে যেন অনুপমাই বলে উঠলো কথাটা।

সত্যি কি তাই ? কে জানে।

বিশ্বাস হারিয়েছিল বলেই কি জীবন হারিয়েছিল সুধীন ?

সে বিশ্বাস কি ফিরে পেয়েছে ও ?

হয় তো।

হ্যাঁ, হাট মাচন্দায় মনসাপূজোর মেলা বসবে আবার।

লোক জমবে, দোকান জাঁকাবে। প্রতিবারের মতই হয় তো দীঘি

দক্ষিণার পাড় পর্য্যন্ত হোগলার ছাউনী পড়বে আবার।

যাত্রার আসর বসবে।

চুলের ফিতে, মাথার কাঁটা।

টুকিটাকি মেয়ে ভোলানো সরঞ্জাম।

মাটির পুতুল, মোমের পুতুল। কাচের পুতুল, কাঠের পুতুল। টিনের পুতুল, সেলুলয়েডের পুতুল।

কাপড়, জামা, রবি বর্মার ছবি। ফটো তোলার দোকান, আর ছবি বাঁধাইয়ের।

সার্কাস। মদের দোকান। এক লাইন গণবধূ।

পাইপটা দাঁতে চেপে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াবে সুধীন – পুতুলের দোকানটার পাশে।

মাটির পুতুল, মোমের পুতুল। চীনে পুতুল, টিনের পুতুল। কাচের পুতুল, কাঠের পুতুল। সোলার পুতুল, সেলুলয়েডের পুতুল।

সব, সবই পুতুল।

জীবন নেই, জীবন হারিয়ে গেছে। সব মানুষই পুতুল হয়ে গেছে, ভাববে সুধীন।

পরিবেশের হাতে গড়া, দুর্ঘটনায় ভাঙা গড়া।

ভাবতে ভাবতে পুতুলের দোকানটার পাশে এসে দাঁড়াবে সুধীন। তেতাসের আড্ডাটার সামনে।

ভিড়ের ফাঁকে মুখ গলিয়ে দেখবে ও, ভাববে।

না। বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সুধীন।

সেই কুশ্রী গ্রহের কুটীল দৃষ্টিটা সরে গেছে ওর শরীর থেকে, সব বিষ ঝেড়ে ফেলেছে ওর শোণিতশিরা।

ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরবে সুধীন।

তারপর, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াবে ও। পিছন ফিরে তাকাবে হয় তো।

না। নেই সেই অচেনা মেয়ের নিলাজ হাসির অভ্যর্থনা। নেই সেই চটুল চোখের কৌতুক।

—ট্রিক্‌টা শিখিয়ে দিলেন না?

স্মৃতির পিঠেই প্রতিধ্বনি তুলবে কথাটা। সত্যিই হাসিহাসি মুখে এগিয়ে এসে এ-কথা কেউ বলবে না আর।